ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী

শিবরাম চক্রবর্তী

পরিবেশক

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৫৭

প্রকাশক
শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ
সাহিত্যায়ণ
২৩ ডি কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শৈল চক্রবর্ত্তী
বিচিত্রিত

মুদ্রাকর
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত
নবীন প্রেস
৬ কলেজ রো, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট মুদ্রাকর
নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ
পি ১৬ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

ব্লক করেছেন
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং
২১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঁধিয়েছেন
ক্যালকাটা বাইণ্ডিং হাউস
১-৫, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

নেবু বাপ্পা

পম্পা

লব কুশ

রত্নাকে

দিলাম

শিবরাম

রসময়ের রসিকতা

মেঘেন, তোমায় বারণ করি। রসময় যদি তোমাকে নেমতন্ন করে, যেয়ো না কদাপি। ওর দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্যে বন্ধুদের সবাইকে ও সাধছে। কিন্তু তোমাকে আমি আগে-ভাগেই সাবধান করে দি, ভুলেও যেন কোনো ছুটি-ছাটার সুযোগে ওর বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ো না।

যদি যাও, তাহলে তোমারো ঠিক আমার দশাই হবে। যারা যারা গেছে, সবারই সেই এক হাল হয়েছে। রসময় আজকাল, কেন যে তা বলতে পারি না, নিজের নামের মর্য্যাদা রাখতে খুব উদ্ব্যস্ত।

নিজেকে সে অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ করতে চায়। র স ম য়—শব্দগুলির উপর লক্ষ্য রাখো, তাহলে এই এক কথাতেই আমার কথার আন্দাজ পাবে। এতেও যদি না বোঝ তাহলে জব্দ হয়ে বুঝবে। এর বেশি বুঝতে হলে ওর রসের ছোঁয়াচ পেতে হবে তোমায়। যেতে হবে ওর বাড়ি। আর সেখানে গিয়েছো কি গ্যাছো! সে দুর্গতি থেকে—মা দুর্গা তোমাকে রক্ষে করুন।

গত শনিবার আমি গেছলাম—রসময়ের বাড়ি—তার আমন্ত্রণ রাখতে।

হাওড়া-আমতা লাইন। আমতা আমতা করে গাড়ি তো পৌঁছুল কোনোগতিকে। ইষ্টিশন থেকে খুব বেশী দূরে নয় ওর

আস্তানা। সোজা রাস্তা ধরে সন্ধ্যের আগেই গিয়ে উঠেছি।

গেট দিয়ে ঢুকেই বাগানের মত খানিকটা। এগুচ্ছি তো এগুচ্ছি, কোথাও কারো টিকির দেখা নেই। চম্‌কে গেলাম হঠাৎ। গাছের ডালে এক প্যাঁচা বসে। খাঁচার মধ্যে ঝুলছে। প্যাঁচাকে যে মানুষ আদর করে খাঁচায় রাখে, রেখে পোষে, আমার জানা ছিল না। কোনোদিনও শুনিনি, যদ্দুর জানি, প্যাঁচা, বাদুর, আর্সোলা, টিকটিকি, চামচিকে প্রভৃতি জানোয়ারেরা ঘরে এসে আড্ডা গাড়লেও গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে নয়।

যাই হোক, ঘরোয়া প্যাঁচা মনে করে ভাবলুম একটু ভাব করি। একটু আদর করা যাক। খুব সাবধানে, ওর গায়ে নয়, খাঁচার গায়ে হাত বোলালুম। ছুঁতে না ছুঁতেই ব্যাটা এমন চ্যাঁচাতে সুরু করলো, কী বলবো।—কোঁকর কোঁ—কোঁকর কোঁ—কোঁ—কোঁ।

কোঁকা-ধ্বনি শুমে ধোঁকা লাগলো—মুর্গি নাকি? প্যাঁচার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না—মা-লক্ষীর ছবির বাইরে চর্ম্ম-চক্ষে কখনো দেখিনি—কিন্তু মুর্গিরা তো আমার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ—প্রতিদিনকার দ্রষ্টব্য—আর তাদের হাব-ভাবও আমার কিছু অচেনা নয়। মুর্গিকে প্যাঁচা বলে ভ্রম করবো এ—কি সম্ভব? এই রকম সন্দেহদোলায় দুলছি, এমন সময় রসময় এসে আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করল।

হাসতে হাসতেই এগিয়ে এলো সে—"এই যে মূর্ত্তিমান! এসে গ্যাছো! প্যাঁচার চ্যাঁচানিতেই টের পেয়েছি যে তুমি

এসেছো। হাঁ করে দেখছো কি? ওটা প্যাঁচা নয়, পাখীই না, ফাঁকি। সেলুলয়েডের বানানো—রেকর্ডে বাজানো এক চীজ্।

হাতাহাতির পরিণাম!

—"বুঝেছি। পক্ষী-আকারে ফক্কিকার?" আমি দম নিয়ে বলি।—"প্যাঁচার ছদ্মবেশে এক প্যাঁচ?"

রসময় হাত বাড়িয়ে দিলো—হাসতে হাসতে। আবেগভরে ওর কর-মর্দন করলুম। কিন্তু নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়েছি কি, অম্‌নি তার হাতখানা ওর কনুয়ের থেকে খুলে এলো। কোনো কথা না বলেই। এসে গেল আমার হাতে!

আমার পিলে চমকে গেছে, বলতে কি। একেই আমার হার্ট উইক্‌—মাঝে ভারী হার্ট ট্রাবল গেছে, তার ওপর—তার ওপরে ভয়ঙ্কর আরেক চোট গেল এখন। কক্ষচ্যুত ওর হাত-খানা হাতে ধরেই নিজের পাল্‌স্‌রেট্‌ নিলাম—ধাক্কা সামলাতে সময় লাগলো আমার।

এদিকে রসময়ের আসল হাত অলেষ্টারের ভেতর থেকে বেরিয়েছে—অট্টহাস্যের সাথে। সে-হাত আমি ছুঁলাম না, আমার হস্তগতখানা ওর অলেষ্টারের পকেটে গুঁজে দিলাম।

"ছদ্মহাত, বৎস!" রসময় বললে। "ঠকে গেলে আবার।"

রসময়ের ছেলেও এগিয়ে এসেছিলো হাত বাড়িয়ে। আবার বোকা হবার ভয়ে আমি আগে সেটা বাজিয়ে দেখলাম। কি জানি, ওর ছেলে যদি ওর মতই প্যাঁচোয়া হয়? কথায় বলে বাপ্‌কো বেটা! তাই হাতে হাতেই বাজিয়ে নিলাম। টোকা মারলাম, চিমটি কাটলাম—তার পরে মুচ্‌ড়ে দেখব কি না ভাবছি কিন্তু আমার রাম চিম্‌টিতেই তাকে উঃ ক'রে উঠতে দেখে—তখন—তবেই—তখনো বলতে কি বেশ সভয়েই তাকে আমি হাতিয়েছি।

ভয় মিথ্যে নয়! হাতটা খাঁটি হলেও ছেলেটার হাতের তেলোয়—অথবা তলায়—একটা নকল তেলো ছিল, রবারের

তৈরী। টিপতেই তার ভেতর থেকে জলের তোড় ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আমার সার্টের তলা দিয়ে বগলের গোলে গিয়ে লাগলো।

আবার চম্‌কালাম। আবার এক গোল! আবার আমার হার। তার উপরে শীতের দিনে সার্ট ভিজে গিয়ে দমেও গেলাম বেশ। "তোমার নাম কি খো—?" ওর হাতে পড়ার আগে যে-প্রশ্ন সুরু করেছিলাম, তা আর সম্পূর্ণ করা হোলো না।

ছেলেটি বল্‌লো—আমার নাম খোকা। হাসতে হাসতেই বলল।

"বছর বারোয় পড়েছে বটে। কিন্তু—"রসময় জানালে: "এখনো ওর কোনো ঘাকা নাম রাখা হয়নি। এতদিন মামার বাড়ি ছিলো কিনা! নামকরণ তো সোজা কাজ নয়! আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে হবে তো। তুমি লেখক মানুষ, দাও না একটা ভালো নাম?"

"রসময়! রসময়ের ছেলে—অসময়। অসময় হলে কেমন হয়?" আমি শুধাই।

"ছেলেমেয়ের আবার সময় অসময় আছে না কি? নামটা ওর মনঃপুত হয় না।

আমার নিজের মতে বিষময় রাখলেই বেশ হতো। পাছে ওর রসালো মনে ঘা লাগে, আ[illegible] বল্ল ও। হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে মা[illegible] চিনির সংকার করা যায় কি না

"চলো চা খাবে চলো। কলকেতা থেকে আস্‌চো—ক্লান্ত হয়েছো খুব।" রসময় বল্লে।

ভেতরে গিয়ে জমলাম। খোকা এক ট্রে চা নিয়ে এলো—কী তার খুশ্‌বু। আর কী বা রঙ্‌! চায়ের তেষ্টা চানকে উঠলো চাইতেই।

"ঐ কুশন চেয়ারাটা টেনে নিয়ে বোসো আরাম করে।" রসময় বললে।

বসতে না বসতেই যেন জগঝম্প বেজে উঠলো। আমিও লাফিয়ে উঠলাম। য়্যাঁ! এ কোথায় বসেছি? ছদ্মবেশী কোনো পিয়োনোর ওপরেই না কি? এ রকম কুশনের চেয়ে কুশাসনে বসাও ঢের সুখের।

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে এ—হচ্ছে তাই! বুঝলে হে গবেট!" রসময় হাসতে থাকে। "কেবল আসনের জায়গায় কুশন বসিয়ে নাও।"

আমি ওর কথায় কান দিই না। খোকা চায়ের কাপ্‌ টিপয়ের ওপর রেখেছিলো—সেই দিকেই মন দিলাম। টিপয়ই সেটা টিপিয়োনো নয়—টিপে দেখেছিলাম আগেই।

পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে দেখি সসারও আমার সন্মুখে এসেছে। চায়ের কাপের সাথে সাথে সেও হাজির—আঠা লাগানো না কি, অ্যাঁ—? তাই তো বটে, আঠা দিয়ে আঁটাই [illegible] পল।

তেলোয়—অথবা তলায় [illegible] লায় আছে, ভিতরে তো আঠা

[illegible] দিনের পরিচয়ে চা

চিনব না এমন নয়। কিন্তু একটু চিনির দরকার। চিনি আমি বেশি খাই। মিষ্টিটাই আমার কাছে আসল, নইলে আর tea miss করতে কী! চায়ের মধ্যেও মিঠে চাই।

কৌটোর থেকে পেয়ালায় একটু চিনি ঢেলে নিয়েছি। ও মা, এ কি! চিনি ভাসতে লাগলো চায়ের ওপর। আমার ধারণা ছিলো চিনি অনেকটা আমার মতই—আমার সগোত্রই। মিষ্টতার দিক দিয়ে যে তা বলছি না, সাঁতার না জানার ব্যাপারেই। চিনি আর আমি—জলে পড়লেই তলিয়ে যাই। ডুবে যাই টুপ করে—আর ডুবে গিয়ে মারা পড়ি।

মিষ্টতায় ইতরবিশেষ থাকলেও আমরা দুজনেই মজ্জমান, ভাসমান নই। কিন্তু চিনিকে ভাসতে দেখে আমাব আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে এল। সাবেক ধারণা টলে গেল আমার। নিজেকে সঠিক চিনি বলে মনে করতে পারলাম না। জলে ঝাঁপিয়ে পরীক্ষা করে দেখার উপায় ছিল কিন্তু চায়ের কাপ ডুব দেবার পক্ষে খুব বেশি কি? অগত্যা, ফুঁ দিয়ে চিনিদের ডুবিয়ে দিতে লাগলাম।

কিন্তু এক ফুৎকারে ডুবে যাবার জিনিষ নয় ও। চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেও লাভ হোলো না কোনো! যতই তাড়া দিই ততই ওরা ঘুরে ফিরে বেড়াতে থাকে এধার থেকে ওধারে। সপ্রশ্ন চোখে রসময়ের দিকে চাইতেই সে সহাস্য মুখে একটা চামচ এগিয়ে দিল।

চামচ নাও, চামচ দিয়ে ঠেঙাও।” বল্ল ও।

চামচের সাহায্যে চিনির সৎকার করা যায় কি না

দেখি। না, অসম্ভব। পুকুরের পানার মত এরা ভাসতেই জন্মেছে, ডুবতে জানে না। একেই চিনির পানা বলে কিনা কে জানে!

চামচ দিয়ে বেয়াদব চিনিদের তুলে ফেলতে যাই—গিয়ে দেখি—আবার রসময়ের হাস্যোদ্রেক্ করেছি।—চায়ে ডোবাতেই চামচ গলতে সুরু করলো। দেখতে দেখতে গোটা চামচটাই গলে চা হয়ে গেল। কাপের সঙ্গে গলাগলি হয়ে একনিষ্ঠ সেই সসারের ওপরে উপচে পড়ার মতো হোলো।

বাপ-ব্যাটাও হাসিতে উপচে পড়লেন। চিনির চলৎ-শক্তিতে আমি অবাক হইনি, বাজার থেকেও ওকে উধাও হতে দেখেচি তো আকচার। কিন্তু চামচের গলৎশক্তিতে চমৎকৃত হলাম যাই হোক, ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির সামনে নিজের বিস্ময়দমন করে পাপ বিদেয় করলাম—চিনি, চামচ চা—সব। এক চুমুকে চালান দিলাম পেটের গর্তে।

বিষময় বললে, আসুন কাকাবাবু, লুডো খেলা যাক্ একটু।

খেলার উৎসাহ জাগে আমার। কিন্তু লুডোর ছক্‌টা কুলুঙ্গির তাক থেকে পাড়তে যেতেই, তার ফাঁক থেকে এইসা এক কাঁকড়া বিছে তড়াক করে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে চম্‌কে উঠে দেখি—যাক্ রক্ষে তবু। সত্যিকার বিছে না। সেলুলয়েডের বানানো।

রসময় একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিলো। আমি বললাম—সিগ্রেট তো আমি খাই না বন্ধু।

"টানো না, আরাম পাবে টানলে। ভয় নেই, খাঁটি সিগ্রেট সেলুলয়েডের নয়।" বললো রসময়।

নিলাম, ধরালাম, টান্‌ছি—প্রথম যাদের হাতে খড়ি ঠিক তাদের মতই—প্রাণপণে! হঠাৎ দুম্‌! সিগ্রেট বলা নেই কওয়া নেই পট্‌কার মত ফেটেছে—আমার মুখের ওপরেই। আমাকেই পট্‌কাবার মৎলবেই!

সারা সন্ধ্যাটা নানা ঝঞ্ঝাটে এই ভাবেই কাটলো। তার পর এলো খাওয়ার পালা। পালা না বলে খাওয়ার ঠ্যালা বলাই উচিত। আলু-ভাজা মনে করে যা চিবেয়েছি তা আলু নয়, কাঁচকলা। কাঁচ-কলার ভাজি। আলুর দম ভেবে যাকে গালে তুলেচি তা আলুর দম নয়, আলুর ভ্রম—ওলের ছলনা। গালে ধরতে না ধরতেই গলা ধরলো। পোস্তর বড়া খেয়েও আরেক পস্তানি। ঠিক যে তা কী বস্তু বলা আমার পক্ষে শক্ত। রন্ধন-বিজ্ঞানে আমি ততোটা পোক্ত নই, তবে মনে হয় করাত-গুঁড়োর কোনো কারুশিল্প-টিল্প হবে।

অবশেষে ঝোলের বাটি ধরে টানলাম। মাছের কালিয়া দমন করা যাক এবার। মাছ জিনিষটার আঁচ পাবো ঠিকই। মাছের মুড়োটাই তুলতে গেলাম আগে।

ছুঁতে না ছুঁতেই সেটা আপনা থেকেই পাতের ওপর লাফিয়ে আসে। পাতের থেকে লাফিয়ে ওঠে আমার মাথায়। আমার মাথায় ওপরেই মুণ্ডপাত! শেষে দেখি মাছের মাথা নয়, কোলা ব্যাঙ্‌। তাও খাঁটি না, সেলুলয়েডের—দম্‌ দেয়া।

এমনি করে, আগাগোড়া ওদের দুজনের হাসির অট্টরোলের

মধ্যে নাকে মুখে দুটো গুঁজে ওঠা গেল। খাওয়ার ঠ্যালা শেষ করে শোবার পালা এবার। এখন বিছানায় গিয়ে লম্বা হতে পারলেই ল্যাঠা চোকে। হাত পা ছড়িয়ে একটু গড়িয়ে বাঁচি।

শোবার ঘরে ঢুকেই আমার দরজায় খিল দিলুম। জানালা-গুলোও আঁটলুম ভালো করে ভেতর থেকে। কি জানি রাত্রেও যদি রসিকতার ঝামেলা সইতে হয়। বীরবল বলেছিলেন ঠিকই, রসিকরা রসি দিয়ে বাঁধে আর সিক দিয়ে বেঁধে। বাঁধা পড়েছি বটে, কিন্তু বিদ্ধ হইনি এখনো—ভয় একটা ছিলই প্রাণে। যদি কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে শিক-টিক এসে খোঁচা মারে—শিক্‌কাবাব বানিয়ে রাখে আমায়? সেই রসিকতার পাল্লা সামলানোর চেয়ে আগেই জানালা-খড়খড়ির পাল্লা এটে রাখা ভালো।

পুরনো, কাঠের চারপায়া। কোনো সময়ে হয়তো খাট ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল চৌকিদারি করে এখন খাটিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। মশারি খাটাবার ডাণ্ডা ছিলো চার পাশে, মশারি ছিল না।

শুয়েছি বিছানায়, কোনো রকমে একটু বিশ্রাম করে রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু পাশ ফিরতেই খাটটা খ্যাঁচ করে উঠলো, এক দিকের পায়া মচ্‌কেছে—প্রতিবাদ করেই সেদিকটা কাৎ। উঠে দেখতে গেছি, অন্য দিক থেকে আরেক হ্যাঁচ্‌কা টান। এক ধারের ডাণ্ডা এসে লাগলো আমার মাথায়। দেখতো না দেখতে আরেকটা পড়লো পিঠের ওপর।

আর্তনাদ করে খাট থেকে নামতে যাবে চারপায়াটা চারখানা হয়ে পড়লো আমার চার ধারে। পড়লো আমার ঘাড়েই—তার ডাণ্ডা-টাণ্ডা সমেত। আমি আর খাটের উপর নেই, খাটই আমার উপরে তখন। তার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমি সমাধিস্থ।

দরজার বাহির থেকে রসময়ের উচ্চহাসি কানে এল—সেই সুসময়ে। বিষময়েরও ফিকফিক শুনলাম। অত রাত্রে খাটকে আর নতুন করে খাটাবার উৎসাহ হোলো না—ঘুমোবার সময় কি কোনো খাটনি কারো পোষায়?—খাটের গর্ভেই যতটা আরামে পারা যায় কাত হওয়া গেল, খাটে না শুয়েই খাটসই রইলাম। মশারির ন্যায় খাটিয়া খাটিয়ে—অকাতরেই।

ঠিক করলাম, সকালে উঠেই এখান থেকে পিট্টান দেব—সকলের অজান্তে। ভোর হতেই উঠে পড়েছি—চোরের মত বেরিয়েছি ঘর ছেড়ে। না, সদর দিয়ে নয়, কে জানে সেধারে যদি কোনো কল-কৌশল করা থাকে। দরজা খুলতে গিয়ে যদি সত্যিই দরজা খুলে যায়—খুলে আসে আমার হাতেই——রসময়ের শ্রীহস্তের মতই? লোকে বাড়ি চাপা পড়ে মরে শুনেছি। কিন্তু আমার মত দুর্ব্বলহৃদয় লোকের পক্ষে একটা দরজার চাপই যথেষ্ট।

খিড়কি দিয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভালো। নিরাপদ অনেক। পা টিপে টিপে এগুলাম। পেছনের দরজা খুলে বাগানের ভেতর গিয়ে পড়েছি। মাঝখান দিয়ে সরু একফালি পথ—খড়-

কুটোয় ভর্তি। ঝরা পাতার স্বরাজ। চলতে গেলে মর্ম্মরধ্বনি ওঠে। সাবধানে পা টিপে টিপে চলেছি। বিচালি বিছানো একটা জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছি—এমন সময়ে হঠাৎ…ঝপাং!

একেবারে পাত্‌কোর মধ্যে ধপাৎ! বিচালির বিছানা যে আসলে আমাকে মজানোর জন্যই—তার তলায় যে পাত্‌কোর উৎপাত রয়েছে তা আমি ধরতে পারিনি।

ধরতে পারলাম, ধরা পড়বার পর। পাতকোর ফাঁদে পা দেবার পর—পাতালে গিয়ে একেবারে!

হায় হায়, বিভুঁয়ে এসে রসিকতার কবলে পড়ে মারা যেতে হোলো শেষটায়। আমি তো রসময়ের চিনি নই যে জলে পড়লেও ভাসবো? জলে পড়লেই আমার জলাঞ্জলি! টুপ করে আমি ডুবে যাবো টপ্ করে,—আমার ভারী কান্না পেতে থাকে।

কিন্তু না, ডুবতে হোলো না। রসময় কাছেই ছিল ওৎ পেতে। আমার পলায়ন-বার্ত্তা এবং পতন-রহস্য কি করে যেন টের পেয়েছিলো। কি করে আগে থেকেই জেনেছিলো কে জানে। সেই এসে টেনে তুললো।

শীতের দিনের সূর্যের মত কাঁপতে কাঁপতে আমি উঠলাম। "সদর পথেই বেরুতে পারতে। সকালে উঠে তোমার যে বেড়ানোর বদ্‌ভ্যাস তা আগে কেন আমায় বলোনি?" সে আপশোষ করে: "আমার বন্ধুদের সবারই দেখছি এই এক ব্যারাম। প্রাতঃভ্রমণের বদ্ খেয়াল। আর, কেন জানি না, সকলেই এই খিড়কির পথটাই বেছে নেয়।"

পৌষ-মাসের সকালে সিক্ত কাপড়-জামায় কাঁপছি—"না, বন্ধু, না। প্রাতঃভ্রমণ নয়, প্রাতঃকালের ভ্রমও না। সকালে উঠে চান করার আমার বাতিক। তাই ভাবলুম প্রাতঃস্নানটা সেরে আসি।" কাঁপতে কাঁপতে বলি।

এই ঠকাটাই বড্‌ডো জোর হয়েছিল—হাতে পায়ে দাঁতে —ঠক্ ঠক্ করছি তখনো।

না খেয়ে নেমন্তন্নে যেয়ো না

"নতুন রেস্তরাঁ খুলেছি ভাই। নেমন্তন্ন করতে এলাম তোমায়।" নিবারণ এসে জানালো।

নেমন্তন্নের কথায় লাফিয়ে উঠি—"বলো কি হে?"

"সব পাবে আমার রেস্তোরাঁয়।" হাতের খাদ্যতালিকা থেকে সে উদাহরণমালা উদ্ধার করতে থাকে—"চপ্, কাট্‌লেট, কারি-কোর্মা, মাম্‌লেট, ফিশ্‌ফ্রাই, মাঠন এবং পাঁঠন—"

"পাঁঠনটা কী?" বাধা দিয়ে জানতে যাই।

'পাঁঠা। সাদা বাংলায়। তবে তোমার ভাষাতেই বলছি কিনা! যাতে তুমি সহজে অনায়াসে বুঝতে পারো। বলতে না বলতেই তোমার বোধগম্য হয়। তারপর আবার কাট্‌লেট কাট্‌লেট দু' প্রকারের—চিংড়ির ও চ্যাংড়ার।"

"চ্যাংড়ার? তার মানে?" আমি ভড়কে যাই। পাড়ার ছেলেদের ধরে ধরে কাটছে নাকি ও? আমার ভাষা, ওর ভাষনে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার ধারণা ছিলো, এক পরীক্ষার খাতায় ছাড়া আর সর্ব্বত্রই ছেলেরা অকাট্য।

"আহা, ঐ চিংড়ির কাট্‌লেটই। তাই আমাদের চ্যাংড়াদের জন্য। চ্যাংড়া যারা, তারা চিংড়ির পেছনে ছুটবে এ তো স্বাভাবিক। তবে তোমাদের জন্য অন্যরকম আছে—ব্রেস কাট্‌লেট।"

আমি বলি: "ব্রেশ!" বেড়ে আর বেশ সন্ধি করে—একসঙ্গে পাকিয়ে—কাট্‌লেটের মত করেই আমার বলা।

"পেঁয়াজী থেকে দোপেঁয়াজী—সব পাবে। পটাটো চপ্ থেকে পটাটো চিপ্স্—যা চাই রামপাখীও।"

রামপাখীর নামে আমার যেন পাখা গজায়। তক্ষুনি তক্ষুনি যেন উড়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর পাকশালায়। দুরন্ত উদর হাত পা ছড়িয়ে উড়ন্ত হতে চায়। উধাও হতে চায় ওর পাখীস্থানের দিকে।

"যেয়ো না, দেখতে পাবে। রামপাখীরা কেমন উড়ছে আমার রেস্তরাঁয়।" হাসতে হাসতে জানায় সে।

"বলো কি? ঠুক্রে দেবে না তো?" ভয় করে আমার।

"উড়ছে বটে, তবে এমনি নয়! কাট্লেট হয়েই উড়ছে। ঠোকরায় না, ঠুক্ত হয়। তোমাদের দ্বারাই হয়ে থাকে।"

আমার ভাষার প্লাবনে নিবারণ আমাকেই ভাসায়। নিবারণ করা যায় না—কিছুতেই।

"কবে যেতে হবে?" ভাসতে ভাসতে বলি।

"খোলাই আছে রেস্তরাঁ।" হাসতে হাসতে জানায় সে: "তবে পয়লা বোশেখ এসো। শুভ উদ্‌বোধন কিনা সেদিন। অনেকরকম খাবার-দাবার হবে। বিকেলের দিকেই এসো, কেমন?" বলে গেল নিবারণ।

এবারে পয়লা বোশেখ ছিল শুক্কুরবার। গুড ফ্রাইডের ঠিক সাত দিন পরে। নিবারণের সৌজন্যে এটাকে বেটার ফ্রাইডে বলা যায়।

তার আগের দিন থেকেই নেমন্তন্ন রক্ষার তোড়জোড় সুরু

করলাম। বেস্পতিবারের বারবেলা পড়তেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলাম সব।

বিকেলের জলখাবার বাদ গেল। রাত্রের রুটীও বরবাদ! শোবার আগে নৈশপান হর্লিকস্—তাও বাতিল! তিল তিল খেয়ে যদি পেট ভর্তি করি তাহলে কাল নিবারণের তাল সামলাবো কি করে?

সকালে বাসার চাকর ডিমের হাফ্‌বয়েল নিয়ে এলো তাও হটিয়ে দিলাম অম্লানবদনে। নিবারণের নেমন্তন্ন না আজ? হাফ্‌বয়েল খেয়ে পেট ভার করব এমন আস্ত 'বয়েল' আমি নই।

তুপুরেও হরিমটর। আর বিকেলে? তখন তো আমি চিঁচিঁ করছি। একটা চিংড়ির কাট্‌লেট পেলেও চিবিয়ে বাঁচি—যদিও শুনেছি তা নাকি আমাদের জন্যে নয়, চ্যাংড়াদের জন্যই।

সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম রেস্তোরাঁয়। শুভ উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে।

দোরগোড়াতেই পাওয়া গেল নিবারণকে। অভ্যর্থনা-সমিতি হয়ে একাই সে দাঁড়িয়ে।

"কী হে, তোমার উদ্বোধনের কদ্দূর?"

"তুমি এলেই হয়।" ও জানালো।—"ভেবেছিলুম কাটজু সাহেবকে দিয়ে উদ্বোধন করবো। তিনিই নাকি সব কিছুর উদ্বোধন করেন—জুতোর দোকান থেকে চণ্ডীমণ্ডপের।"

"ভালই হোতো তাহলে।" আমি বলি: "লাট সাহেবরাই তো উদ্বোধন-সম্রাট আজকাল।"

"হ্যাঁ, সব কাজের কাজী। সব কাজের কাটজুও বলতে পারো। কিন্তু পাড়ার সবাই বাধা দিলো আমায়। বল্লে, পেয়েছো কি তুমি? হুট বল্লেই তিনি ছুটে আসবেন? লাটসাহেব কি তোমার কাটলাট নাকি? আমার কাট্‌লেটের নাম খারাপ করে বল্‌লো। তোমার ভাষাতেই বললো বলে মনে হচ্ছে। যাক্ গে, বলুক গে! অগত্যা..."

শুনতে শুনতে আমি রেস্তরাঁর ভেতর এসে বসেছি।

"অগত্যা ঠিক করলাম," এক প্লেটে গোটা কয়েক কাজু বাদাম এগিয়ে দিলো ও: "এখন এই কাটজু বাদাম দিয়েই তোমার শুভ উদ্বোধন হোক্।"

বাদামগুলো পেটের আগুনে পড়লো যেন ঘিয়ের ছিটের মতই। আসল খাদ্যের আহুতির আশায় ওর দিকে তাকাতে গিয়ে সামনের দেয়ালে নজর ঠেকলো আমার। সেখানে একটা কার্ড-বোর্ড লটকানো, তাতে লেখা—

আ জ ন গ দ কা ল ধা র

এ আবার কী রে? নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে এ কেমন কথা? মুখে না বলে ঘুরিয়ে বলা সম্মুখে? আর ঐ ভাবে? ডেকে এনে ডকে তোলা—এ কি রকমের ভদ্রতা বাবা?

ভাবলাম রেস্তরাঁর অন্যধারে বসি গিয়ে—যাতে ওটা আমার চোখে না পড়ে। চোখে না পীড়া দেয়। কিন্তু তাতেই বা কি! স্মৃতিশক্তি বলে একটা জিনিস আছে তো? এমন কি,

আমারো আছে। যে ধারেই বসো, তোমাকে নগদ্ বসতে হবে একথা মনের মধ্যে গঁদের মত এঁটে থাকে, সেখান থেকে মোছা যায় না কিছুতেই!

ভাবতেই খিদে আমার মাথায় উঠে যায়!

দেয়ালের মাথায় তাকিয়ে আছি, খেয়ালের মাথায় ওরও চোখে পড়েছে কখন্!

"হ্যাঁ ভাই, ওটা লাগাতে হোলো—বাধ্য হয়েই। আগে আমি বসিরহাটে চায়ের দোকান খুলেছিলাম, সেখানকার লোকে ধারে খেয়ে খেয়ে বসিয়ে দিলো আমায়। বন্ধুদের ধার দিলে আর তারা ধার মাড়ায় না, জানো তো? আবার এখানে ধারে খাওয়ালে কোনোদিন কি আর উদ্ধার পাবো? তোমাদের বন্ধুত্ব আমি অমূল্য জ্ঞান করি—তারপর যদি তোমরা ধারে খাও তার মূল্য আরো বেড়েই যাবে দিনকের দিন। তখন সেই বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করা কি সম্ভব হবে কখনো? না ভাই, তোমাদের বহুমূল্য বন্ধুত্ব আমি খোয়াতে পারবো না। আমাকে তোমরা মাফ করো।"

নিবারণের অমন বক্তৃতার পর আমাকে পকেট হাতড়াতে হোলো। নিবারণের নয়, নিজের। টাকা সিকি, দুয়ানি, ডবল পয়সা, আধুলি, আনি, ফুটো পয়সা সব মিলিয়ে গোটা পাঁচ দাঁড়াবে আঁচ পাওয়া গেল।

"ঠিক কথা! বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে কে রাখিবে? আনো তোমার খাবার, নগদ্ নগদ্। কুছ পরোয়া নেই। দেখি খাদ্যতালিকা আজকের?" পকেট থেকে হাত বের করে বল্লাম।

নিলাম হাতে খাদ্যতালিকা। ফাউল রোস্‌টের তলায় দাগ মেরে দিলাম ওকে ছেড়ে।

রোস্‌টের ফরমাস দিয়ে রোস্‌ট্‌ নিচ্ছি—খিদের বেড়া আগুনের মধ্যে। কিন্তু এক প্লেট আনতে নিবারণ এত লেট খাবে কে জানতো! মুর্গি-জবাই করেই আনছে নাকি?

টেবিলের কাগজগুলো নাড়তে লাগলাম। নতুন আর পুরোনো খবর-কাগজ জড়ো করা যতো রাজ্যের !....পাটনায় আকাশ থেকে মাছ-বর্ষণ হয়েছে। কলকাতায় মাছ বিরল। কলকারখানার ধর্মঘট। ধর্মতলায় মোটর চাপা পড়েছে একজনা।...

নিবারণ ফিরে এলো তালিকা হাতে। আমার সামনে পেন্‌সিল দিয়ে কেটে দিলো রোস্‌টের নাম—তার তালিকার থেকে।

"নেই ভাই। এই কেটে দিলুম। ফুরিয়ে গেছে আমার রোস্‌ট্‌।"

"বেশ। তাহলে নিয়ে এসো তোমার সেই ব্রেস কাটলেট, তাই খাবো।"

চলে গেলো নিবারণ। দাগমারা তালিকা হাতে।

বসে আছি। পড়ছি খবরের কাগজ।...পণ্ডিত নেহরুর পায়ে কড়া পড়েছে। ম্যাট্রিকের অংকের প্রশ্ন এবার কড়া হয়েছে বেজায়। পরীক্ষার হলেও দারুণ কড়াকড়ি। কেউই কিছুতে প্রসন্ন নয়।

"না ভাই, কাটলেটও নেই। ফুরিয়ে গেছে সব। ভারি কাটতি আমার কাটলেটের।" নিবারণ এসে জানায়—মিনিট

তালিকার থেকে তালাক্!

দশেক বাদে। সঙ্গে সঙ্গে তালিকার থেকে কাটলেটের নামটা কাটা পড়ে।

তালিকাটা ওর হাত থেকে নিলাম। তাকিয়ে দেখলাম। খতিয়ে দেখি, নিজের বেশী ক্ষতি না করে আর কী কী খাওয়া যায়?—"আচ্ছা, একটা মাটন্ চপ খাওয়া যাক্। কী বলো? মাটনের চাপ—সইবে তো আমার?"

"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।"—বলে নিবারণ ফের অনুযোগ করে: "তবে তোমার কথা বলতে পারি না। তোমার তো শরীর নয়, একটা কলেবর।"—বলেই সে চলে যায়।

আবার পড়ছি মন দিয়ে কাগজ।...আগ্রার নাপিতরা কামাতে রাজী নয়। উড়েরা কলকাতায় কিন্তু বেশ কামাচ্ছে—দাড়ি নয়, টাকা। আমাদের টাকাকড়ি যে কোন দিক্ দিয়ে উড়ে যায়, জানা যায় না—আমি না-কামানো গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবি।

নিবারণ এসে হাজির—খালি হাতে।—"না ভাই, মাটনও নেই, ফুরুৎ! পাঁঠন আনবো?"

"পাঁঠন্? তাই আনো।"

মাটন চপের নাম কাটা পড়লো তালিকার থেকে। মাটন কেটে পাঁঠন আনতে ছুটলো সে। আবার আমার কাগজ পাঠ। এবারে কতকগুলো কিশোর মাসিক নিয়ে পড়লাম।

দেখি সমস্ত ধাঁধার উত্তর ভুল হয়েছে আমার। সম্পাদকের কাছে পাঠানো সব কবিতা অমনোনীত। রামধনু, মৌচাক, শুকতারা—সব জায়গাতেই সমান তাড়না আমার ভাগ্যে।

সুখ নেই কোনোখানেই। কেউ নাম ছাপায় না! নাহক্ এদের গ্রাহক হওয়া—দেখছি!

অনেকক্ষণ পরে ফেরত এলো নিবারণ। "না নেই। তোমার পাঁঠনও নেই।" জানালো এসে পত্রপাঠ।

"দাও আমাকে।' ওর হাত থেকে কাগজখানা নিই—''এবার আমি নিজে কাটি।" বলে তালিকার পিঠে পাঁঠার চপের ওপর আমার পেনসিল চালাই। ভালো করে কেটে দিই কালো করে। তালিকার থেকে তালাক্ দি!

"ভারী কাটতি কিনা আমার দোকানে!" কৈফিয়তের সুরে ও বলে।

"তাই আমিই কাটলাম—আমার হাতেও কিছু কাটতি হোক্।"

"ভালোই করেছো—তবু যাহোক্ একটু বউনি হোলো তোমার হাতে।" তালিকাটা ও নিলো।

"তাহলে আর কী আছে তোমার রেস্তরাঁয়?" পেটের জ্বালায় আমি জ্বলে উঠি।—"পটাটো চপ্? পটাটো চিপ্? দোপেঁয়াজি? আর কিছু না থাকে, নাহয় তোমার পেঁয়াজিই কিছু ছাড়ো না এখন।"

"দেখি কী আছে, দাঁড়াও।" বলে ফের চলে যায় ও।

ওর কথায় অবশ্যি আমি দাঁড়াই নে। বসেই থাকি। বলে বসে বসেই হাতে পায়ে খিল লাগার যোগাড়, এর পর ফের দাঁড়াতে হলেই তো হয়েছে!

আবার পড়াশুনায় মন দিই। খিদেটা ভুলে থাকা যায় যতক্ষণ। কাগজ চাপা দিয়ে নিবারিত করা যায় যতখানি।...

কালোবাজারের চাহিদা বেশি—পড়ি খবরের কাগজে। ভালো জিনিসের কদর নেই। জিনিসের দর চড়ছেই। লেখাপড়ার চর্চা কমছে। শিলচরের এক ছাত্রী তার মাষ্টারনীকে কিল চড় বসিয়েছে বলে জানা গেল।......

নিবারণকে চপেটাঘাত করলে কেমন হয়? ওর পটাটো চপের এক ঘা? কসে ওর মুখের ওপর বসাই যদি?

বসে আছি তো বসেই আছি, অনেকক্ষণ বাদে নিবারণ এসে খাড়া হয়। খালি হাতে। একেবারে খালি হাত না—পেনসিল আর খাদ্যতালিকাটা আছে। "ভাই, ভারি দুঃখের বিষয়—" ও মুখ ভার করে স্থরু করে।

"কিচ্ছু বলতেহবে না। কাটৃতির কথা আমার জানা আছে। তোমার খাদ্যতালিকার তলায় আমার নামটা লেখো দিখ এবার।"

"তোমার নাম?"

"হ্যাঁ, লেখো না—যা বলছি!"

লেখে সে—একটু আপত্তির সঙ্গেই। "আমার তালিকায় তোমার নাম কেন? তোমার নাম লিখবো কেন? তুমি কি একটা খাদ্য?" লিখতে লিখতে সে বলে।

"অখাদ্য হলেও লিখতে কী? খেতে তো আর পাচ্ছি নে। লেখো তুমি।"

নিবারণ লিখলো।

"এইবার কেটে দাও—পেন্‌সিল দিয়ে।" আমি বলি। "বেশ ভালো করে কাটো।"

"তার মানে?"

"তার মানে—আর আমিও নেই এখন।"

নিবারণ কাটে একটুও দ্বিধা না করে। এতদিন ধরে খাদ্যা-খাদ্যের কাটাকুটিতে ওর হাত পাকা হয়েছিল। অভ্যেস যাবে কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেটে পড়ি। আমারও কাটতি হয়ে যায়—দেখতে না দেখতেই।

দলের লোকদের বলো

বিছানায় বসে সকালের চায়ের পেয়ালা সবে মুখে তুলছি, রাজেন এলো লাফাতে লাফাতে। একটা চিরকুট হাতে করে।

"আজ রাত্তিরে আমাদের ব্যাঙ্ক লুট হবে!" হাঁফাতে হাঁফাতে সে বল্লে।

পেয়ালার চা চল্‌কে উঠলো, চাদরের ওপর পড়ে গেল খানিক,—কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

এই বার্ত্তা ওর আরেক বার্ত্তালা বলে মনে হোলো আমার। রোজ রোজ নতুন নতুন গুজব নিয়ে আসা কাজ রাজেনের। ও ছিল রাজা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী, আর আমি ছিলাম সেখানকার এক কেরাণী। কাজটা ওই জুটিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

আফিস যাবার পথে, আমার কপাল, রোজই ওর বকুনি শুনতে হোতো আমায়। এমনও হয়েছে, ওর নাম ভুলে গিয়ে, রাজেন না বলে গজেন বলে ডেকে বসেছি ওকে—ওর গজগজানির চোটে।

প্রতিদিন ওর গজালি শুনে শুনে কান রপ্ত ছিল আমার। সেই সব রপ্তানির পর এই ফের আরেক নতুন আমদানি—এই আমার ধারণা হোলো।

"জানি আমি।" আমি বল্লাম: "আজকের কাগজেই পড়লাম তো। লুঠের বিশদ বর্ণনা প্রকাশ করেছে। একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ।"

"যাও, বোকার মতো বোকো না বাজে। খবর-কাগজে পড়বে কাল। কালকের কাগজে বেরুবে সব। আর তার সমস্ত খবর আছে এই—"

এই বলে সে তার হাতের চিরকুটখানা নাড়তে লাগলো—"এই আমার হাতের কাগজে।"

আমি চিরকুটটার দিকে ভিরকুটি করলাম।

"আসছিলাম আমি তোমার বাসায়," তার-স্বরে বলতে লাগলো সে: "এই কাগজের টুকরোটা উড়তে উড়তে এসে পড়লো আমার মুখের ওপর। কোথ্থেকে এলো কে জানে! আমি মুখ থেকে সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছি, দেখি, কী যেন লেখা, আমার চোখে পড়লো হঠাৎ। তারপর—পড়েই দ্যাখো না, পড়লেই টের পাবে।"

পড়ে দেখলাম। কাগজটার এক কোণে পেন্সিলের আঁচড়ে লেখা:

"রাজা ব্যাঙ্ক ৩-৩০, দলের সবাইকে বলো।"

"বুঝলে এবার?…" রাজেনের ধারাবাহিক বিবৃতি সুরু হোলো আবার: "দলের যে সর্দার সেই এই চিরকুট পাঠিয়েছে তার সাকরেদের কাছে—দলের সবাইকে খবরটা দেবার জন্যে। খুব সম্ভব সাকরেদটা দোতলা বাসে বসে হাওয়া খাচ্ছিল—মনে হয়, যাচ্ছিল দলের লোকদের আড্ডায় এটা জানাতেই—এমন সময়ে কি করে তার হাত ফস্কে—হাওয়ার চোটেই হবে হয়ত —বাসের দোতলায় কিরকমের জোরালো হাওয়া জানো

তো ?—কাগজখানা উড়তে উড়তে আমার মুখের ওপর এসে পড়ে—আর আমার নাকে লেগে আটকে যায়...”

“তার পরের খবর আমার জানা।—তোমাকে আর বিস্তৃত করে বলতে হবে না।” আমি জানালাম।

“তোমার জানা ? ছাই জানা তোমার।” রাজেন যেন লাফিয়ে ওঠে: “কচু জানো তুমি। তারপরের খবর হচ্ছে, এই চিরকুট নিয়ে আপিসে গিয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে আমি দেখাচ্ছি। তিনি পুলিশে খবর দিচ্ছেন। পুলিশ এসে যথাসময়ে লুঠেরাদের হাতেনাতে পাকড়াচ্ছে। দুর্দান্ত দস্যুদের ধরিয়ে দেবার জন্যে সরকার থেকে আমি মোটা রকমের পুরস্কার মারছি। আর ব্যাঙ্কে ? ব্যাঙ্কে আমার প্রমোশন হচ্ছে। চাই কি, এইজন্যেই হয়ত আমি সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কাজটা পেয়ে যেতে পারি। সাতশো টাকা মাইনের চাকরিটাই।”

“খুব ডিটেকটিভ বই পড়ছো বুঝি আজকাল ?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“ডিটেকটিভ বই পড়ার সঙ্গে এর কী ?” রাজেন আমার প্রশ্নের পাশ কাটায়—“এ ছাড়া এই চিরকুটের আর কী মানে হতে পারে শুনি ?”

কী মানে হতে পারে ? মনে মনে ভাবি খানিক। কিন্তু শক্ত শক্ত কথার মানে কোনদিনই আমার মগজে আসে না। আমি মাথা চুলকাই। অভিধানেও যে এর মানে মিলবে তা আমার বোধ হয় না। মাথা চুলকে আমি বলি—“লুঠের কথা এই চিরকুটের কোথায় আছে বলো দেখি ? সামান্য একটু বুদ্ধি

খেলালেই বুঝতে পারতে, জনকতক লোক সখ করে এমনি আমাদের ব্যাঙ্কে এসে মিলতে চাইছে—এই তো!”

“তিনটে ত্রিশে? আজ শনিবার না? ব্যাঙ্ক বন্ধ না তখন? তখন বুঝি ব্যাঙ্ক খোলা থাকে বাইরের লোকের জন্যে? আর, কোনো ব্যাঙ্ক কি পার্ক যে জনসাধারণের মিলন-স্থান হতে যাবে?”

“তাহলে তারা ব্যাঙ্কের বাইরেই এসে মিশবে।” আমি বলি।—“এ ছাড়া কী?”

“ব্যাঙ্কের বাইরে মিশবে? কিন্তু কেন শুনিতো? তার কারণ কী তা আমি জানতে পারি? শনিবারের বাজার আজ! আপিস দপ্তর বন্ধ সব তখন। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের তিন সীমানায়ও কোনো সিনেমা হাউস নেই যে তারা বায়স্কোপ দেখার জন্য জুটবে। তা ছাড়া, থাকলেও, তিনটে ত্রিশে—ম্যাটিনি শো স্বরু হয়ে যেত তখন। আমাদের ব্যাঙ্কের সামনে কোনো বাস্ ষ্টপ্ নেই যে বাসের জন্য এসে দাঁড়াবে। অবশ্যি এটা খুব দুঃখের বিষয় যে ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়ে এখনো কোনো বাস যায় না…”

ওর কথাগুলো আমার কানে লাগে—প্রাণেও লাগে। বিশেষ করে আমাদের রাস্তায় বাস না যাবার কথাটা।

“……তারপর দল। দলের কথা কেন হে? দলের সবাইকে বলো—এ কেমন কথা? খবরের কাগজে দলাদলির কথা থাকে আমি মানি। তবে তা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু এই সামান্য চিরকুটে দলের কথা থাকলেই সন্দেহ জাগে। মনে হয় মিলন-স্থান ওদের ব্যাঙ্কই বটে কিন্তু

মিলন-লগ্নটা বিকেলে না, রাত্তিরে—কৃষ্ণপক্ষের তিনটে ত্রিশ। আর, রাতের শেষ পহরে কী ধরণেরও স্তাদরা ব্যাঙ্কের কাছে এসে মিলতে চায়, ভেবে ছাখো একবার!"

আমি ভেবে দেখি। ইদানীং এ তল্লাটে ছোটখাট রাহাজানি হচ্ছিল বটে, কিন্তু তাই বলে রাজা ব্যাঙ্কের হানি হবে তা কিছু ভাবা যায় না। ব্যাঙ্ক-মারা কি এতই সোজা? আর আজ রাত্তিরেই যে কেন ঐ কাণ্ড ঘটবে তা ভাবতে পারি না। কাল কিংবা পরশু রাত্তিরেও তো হতে পারে। তিনটে ত্রিশ কিছু আজকের রাতেরই একচেটে নয়। কথাটা বলি রাজেনকে। রাজা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি, এবং আসলে একটি খাজা হলেও বলি।

"হ্যাঁ, ওটা একটা কথা বটে।" সে আমার কথাটা মানে; "কিন্তু বাপু, ব্যাঙ্ক লুটের মত কাজ হঠাৎ কিছু ঝপ্ করে হয় না। অনেক দিন ধরে ফন্দীর পর, অনেক প্ল্যান এঁটে, আট ঘাট বেঁধে তবে সমস্ত ঠিক করা হয়। এসব করে দলের পাণ্ডা। তারপর সব কিছু ঠিক-ঠাক হয়ে গেলে তখন জানানো হয় দলের লোকদের—একেবারে শেষ মুহূর্তে। কেননা আগে থেকে জানালে তারা গল্পগুজবে বাইরের লোকের কাছে সব বেফাঁস করে বসতে পারে। তার থেকেই আমার ধারণা…"

কিন্তু তখনো আমার বিশ্বাস হয় না। এমন কি, এও আমার মনে হয়, ঐ চিরকুট, পেনসিলের লেখা আর উক্ত কাহিনী ও বানিয়ে এনেছে—আজ সকালে আমার কাছে ফলাও করে বলার জন্যেই!

কিন্তু আপিসে গিয়ে ধারণা আমার টলে গেল। খবর পেলাম প্রচুর টাকা এসে পড়েছে ব্যাঙ্কে, অন্যান্য ব্যাঙ্কে পাচার হবার অপেক্ষায়। কিন্তু সোমবারের আগে সে-টাকা স্থানান্তরিত হবার না।

যাও বা সন্দেহ ছিল আমার, এই যোগাযোগ দেখে দূর হোলো। দুয়ে দুয়ে যোগ করে যেমন চার মেলে তেমনিই যেন রাজেনের সমাচার মিলে গেল। রাজা ব্যাঙ্কে, আমি নই, আরেকজনকে রাজা হতে দেখলে স্বভাবতই ভালো লাগবার কথা নয়, তাহলেও রাজেনকে মুক্তকণ্ঠে আমার অভিনন্দন জানালাম।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" সারা মুখ জুড়ে ও হাসলো: "তোমার প্রতিবাদে আমি কিছু মনে করিনি। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। সবার মাথা কিছু সমান নয়।"

লজ্জিত হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে এলাম। চলে এলাম—আমার নিজের টেবিলে। চড় খেয়ে ফিরে এসে নিজের চরকায় মন দিলাম।

কাজ করতে করতে আমার মাথা ঘামে। পুলিশ এসে ডাকাতদের কেমন করে পাকড়াবে সেই কথাই ভাবি। ব্যাঙ্কের মালখানায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে নাকি? যেই না ওরা সিঁধ কেটে, কিংবা দরজার তালা ভেঙে সেঁধুবে অমনি গিয়ে খপ্ করে একেবারে, যাকে বলে, হাতে নাতে গেরেপ্তার? অথবা, হয়তো তারা ব্যাঙ্কের বাইরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ওৎ পেতে থাকবে। লোকগুলো এসে লুঠ করে

নিয়ে যাবার পর তাদের পিছু পিছু ফলো করে আড্ডায় গিয়ে হানা দেবে। বামাল সমেত সবাইকে সামলাবে···এক সঙ্গে ? যাকে সংস্কৃত করে বলা চলে, ফলোয়েন পরিচিয়তে!

ভাবতে ভাবতে আমার যেন কী হয়। তারপর থেকে যাকেই দেখি তাকেই আমার সন্দেহ লাগে। যারাই চেক ভাঙাতে কি টাকা জমা দিতে আসে আমার মনে হয়, এক একটি ব্যাঙ্কমারু! কারো হাবভাব চালচলন সুবিধের নয়!

আর চেহারাগুলোও যেন কেমন সব! ঠিক চোর ডাকাতদের যেমন হয়ে থাকে। লুঠেরাদের চরই যে চোরাগোপ্তা চারিদিকে ঘুরছে—আসছে যাচ্ছে—ব্যাঙ্কের অন্ধিসন্ধির খবর নেবার তালে রয়েছে, এই আমার মনে হয় খালি।

টিফিনের সময় পাঁউরুটিতে কামড় দেবার ফাঁকে পাশের একজনের খবরের কাগজে আমার নজর পড়ল। কাগজের এক জায়গায় কালি দিয়ে দাগ মারা একটা কথা—রাজা ব্যাঙ্ক : ৩-৩০! চৌকো চৌহদ্দির মধ্যে চৌকস্ খবরটা জ্বল্‌জ্বল্ করছে ছাপার অক্ষরে। চোখে পড়লো আমার।

কাগজের সেটা ঘোড়ার পাতা—যেখানে শনিবারে ঘোড়-দৌড়-খেলার খবর থাকে। রাজা ব্যাঙ্ক নামক ঘোড়াটা সেদিন সাড়ে তিনটের দৌড়চ্ছে।

"রাজা ব্যাঙ্কের জানো নাকি কিছু?" জিজ্ঞেস করলাম লোকটাকে।—"খবর রাখো কোনো?"

"ওটা বাজি মারার ঘোড়া। হট্ ফেভারিট্, নির্ঘাৎ জিতবে আজ।"

কাগজের কোণটা ছিড়ে নিয়ে ছুটলাম রাজনের খোঁজে।—"ওহে, শোনো শোনো। তুমি কি ম্যানেজারকে বলেছো নাকি কথাটা ?"

"না, বলিনি এখনো। এইবার বলব। তাঁর লাঞ্চ শেষ হোক আগে।"

"তাহলে আর বোলো না। এই ছাখো।"—আমার হাতের টুকরোটা ওকে দিলাম: "বেঁচে গেছো খুব! আর একটু হলেই সকলের উপহাসের পাত্র হতে। ঠাট্টা করতো সবাই তোমায়। এমনকি, পুলিসরাও।"

বলেই আমি ভ্রম সংশোধন করি: "উঁহু, পুলিশে ঠাট্টা করে না। ঠাট্টা করার পাত্র নয় তারা। ডাকাত ধরতে এসে না পেলে উল্টে তোমাকেই পাকড়ে নিয়ে গাঁট্টা মারতো থানায়।"

রাজেনের চোয়াল ঝুলে পড়ে। ওর সাতশো টাকার সাব্-অ্যাসিস্ট্যান্ট্ ম্যানেজার হবার স্বপ্ন ঘোড়ার খুরের চোটে উড়ে যায় কোথায়! এক মুহূর্তেই।

ওকে মুষড়ে পড়তে দেখে আমি ওকে উস্কে দিতে লাগি—"মনমরা হোয়ো না, ছি! এর জন্য আমি কিছু মনে করিনি। অশ্বরাজ আর রাজা ব্যাঙ্কে তালগোল পাকিয়ে বসেছো—তা, অমন হয়েই থাকে। অনেকেই করে অমন! হাতের পাঁচটা আঙুল কখনো সমান হয় না। সবার মাথা কিছু সমান নয়।"

আস্তে আস্তে ঘাড় তোলে সে—"যাক্, আজ আমি ঐ ঘোড়াই ধরবো তাহলে। মাঠেই যাবো আজ। ঘোড়ার খবরটা

যখন আপনার থেকে ভেসে এসে আমার কপালে লেগেছে—”

“কপালে নয়, নাকে।” আমি শুধ্‌রে দি।

অশ্বমেধের স্বপ্ন !

“একই কথা। কপাল থেকেই নাক। তখন যা থাকে কপালে।” আবার ওর মুখে হাসি ফোটে।

"হ্যাঁ, যদি কপালে লাগে, তাহলে সাতশো টাকার মাইনে কী, তুমি নিজেই একটা টাঁকশাল বনতে পারো। মনে করো, যদি বাজি জিতে হাজার দশেক টাকা পাও, তুমি একটা ছোটখাট কারখানা খুলতে পারো। পারো না কি? আর এই আক্রার বাজারে একখানা কারখানা হাঁকড়াতে পারলে তো রাতারাতিই রাজা!" হাত পা নেড়ে আমি বাৎলাই: "আর তখন তুমি নিজেই একটা ব্যাঙ্ক। রাজেন ব্যাঙ্ক।"

এই বলে, আমি ওর কল্পনানেত্র উন্মীলিত করতে যাই: "তোমার আজকের ঐ মাঠের কাণ্ড। আর ঐ কাণ্ড থেকেই তোমার কারখানা। আর তার পরেই তোমার কাণ্ড কারখানা।' কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে জগাই-মাধাইয়ের মত—মাণিকজোড়।"

সে-মাসের সমস্ত মাইনেটা রাজেন সেদিনের তিনটে ত্রিশে রাজা ব্যাঙ্কের ওপর লাগালো। কিন্তু ঘোড়াটা আশামত আগালো না। এলো সকলের শেষে। রেসের মাঠে হার হোলো রাজেনের। তারপর থেকে রাজেন আর আমার সঙ্গে কথা কয়নি। আজ পর্যন্ত না। কথা না বার্তা না—বার্তালা তো নয়ই। রাজেনের রাজত্ব থেকে আমার প্রজাত্ব গেছে। তার কারণ? তার কারণ, তার রেসের হার নয়—সেই ডিগবাজি না, মাঠের সেই হয়রাণি (বা হয়-running) নয়, তার কারণ হচ্ছে…মাঠময় সেই হরির লুঠের পর আরেক হরিবল্ লুঠ হোলো। সেই রাত্তিরেই। সেও প্রায় সাড়ে তিনটেই হবে রাত—আঁচ পাওয়া গেল যদ্দুর। উক্ত চিরকুটের লিখিতমত, কাঁটায় কাঁটায়, রাজাব্যাংক ভেঙে লুঠ করে নিয়ে গেল ডাকাতরা।

সূত্র

দেহটা সব আগে চোখে পড়লো খান্‌সামার। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য! দশ বছর ধরে সে কাজ করছে এখানে—ব্যাঙ্কের মালিকের পেয়ারের খানসামা হয়ে; কিন্তু এহেন দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নি। দেহটা পড়ে রয়েছে খাবার ঘরের মেজেয়। মালিকের নিজের দেহ।

ধরাশায়ী মালিক। চেয়ারটা ওলটানো। খাবার টেবিলে পিরিচের ওপরে একটা অমলেট আধ-খাওয়া পড়ে। ফল-মূলরাও অবহেলায় পড়ে আছে। আর মালিক পড়ে আছেন অমলেটের থেকে পাঁচ হাত দূরে। তাঁর চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। জিভ্‌ আধহাত বার করা। অম্‌লেটের জন্যই লালায়িত কিনা ঠিক করে বলা কঠিন।

ইদানিং গর্‌হজ্‌মি যাচ্ছিল মালিকের। মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল তিরিক্ষে। অমলেটদের তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। কাউকেই না। তাহলেও তিনি অম্‌লেটের থেকে পাঁচ হাত পিছিয়ে থাকবেন এতটা ধারণা করা যায় না। খান্‌সামা এগিয়ে মালিককে তুলে ধরতে গেল। আর, ধরতে না ধরতেই টের পেল যে এখানকার অন্নজল তার উঠেছে। মালিকের অধঃপতনের সাথেই। তাকে অন্যত্র খানসামাগিরির চাকরি খুঁজতে হবে এখন।

কর্তার দেহরক্ষার জন্যে সে তেমন দুঃখবোধ করল না। ইদানিং তিনি এমন খিটখিটে হয়ে উঠেছিলেন—দিনরাতই তাঁর

মেজাজ চড়ে থাকত। কি ঘরের আর কি আপিসের, সবার সঙ্গেই এমন রূঢ় ব্যবহার তিনি করতেন যে তাঁর তিরোধানে কারোই বিচলিত হবার কথা নয়।

খানসামা গৃহ স্বামিনীকে গিয়ে নিবেদন করলো।

গিন্নী শুনে মর্মাহত হলেন।—"কী সর্বনাশ!" তিনি বল্লেন, "টিকিটগুলো নষ্ট হোলো দেখছি। আজ তো আর তাহলে সিনেমায় যাওয়া যায় না!"

খানসামা ঘাড় নাড়লো। না, আজকের দিনটায় সিনেমা দেখা লোকচক্ষে খারাপ দেখায়।

"কী করতে হবে এখন?" শুধোলেন মালিকের স্ত্রী।

"আমি যদ্দুর জানি মা", জবাব দিলো খানসামা: "মানে, গোয়েন্দা-কাহিনীর বই পড়েই আমার জানা,—এ রকম অবস্থায় থানায় খবর দিতে হয় নাকি। পুলিশ ডাকাই নিয়ম।"

"হ্যাঁ, তাই বটে! বেসরকারি কোনো গোয়েন্দার সন্ধান না জানা থাকলে তাই করতে হয় বটে। নইলে সখের গোয়েন্দারাই এসে খুনের কিনারা করে দেয়—পুলিসের এসে পড়বার আগেই। তাই নয় কি? তুমি কি বলো?"

"ডিটেকটিভ বইয়ে সেরকমও পড়েছি বটে।" খানসামায় সায় দেয়।

"তাহ'লে মিষ্টার কল্‌কেকাশিকে ফোন্ করে খবর দাও। বিখ্যাত ডিটেকটিভ হুঁকাকাশির ভায়রা ভাই কল্‌কেকাশি। তাঁর চেয়ে বড় গোয়েন্দা আর কে আছে এখন? তা ছাড়া, কর্তার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্বও ছিলো খুব।"

শ্রীযুত কলকেকাশি মাঘের শীতে নিজেকে রাগ্-এ জড়িয়ে বসেছিলেন আরামে—এমন সময়ে এল ফোন্। রাগান্বিত হয়েই তিনি টেলিফোনের সাড়া দিলেন। কিন্তু খবর পেয়ে আর রাগত হয়ে থাকা গেল না। ছুটতে হোলো তাঁকে তক্ষুনি।

অকুস্থলে পৌঁছতেই খানসামা তাঁকে নিয়ে গেল খানার ঘরে। হাজির করলো মালিকের কাছে। কর্ত্রীও গেলেন সাথে সাথে।

মালিক শুয়ে ছিলেন তেমনিই। একটুও নড়েননি।

ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলেন কলকেকাশি। কিন্তু পরীক্ষা করার কিছু ছিল না। মৃতদেহরা যেমন হয়ে থাকে—অবিকল সেই রকম! একেবারে নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু।

"খতম্!" বল্লেন কলকেকাশি ; "সাবাড় করে দিয়েছে।"

খানসামা বল্লো—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু করলো কে?" কলকেকাশি প্রথমে খানসামা, তারপরে গিন্নীর মুখে তাকালেন। তারপরে কর্তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন। কিন্তু তিনজনের কেউই তাঁর কথার জবাব দিতে পারলো না।

অতঃপর আবার তিনি কর্তাকে নিয়ে পড়লেন। যদি কোনো সূত্র মেলে। কর্তার বুক-পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ মিললো—সেটা পড়ে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল আরো। কাগজটা নিজের পকেটে পুরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—"এবার আমি আপনাদের কয়েকটি কথা জিগেস করবো। ইচ্ছে

করলে জবাব নাও দিতে পারেন। প্রথম কথা, তাঁর কি কেউ শত্রু দাঁড়িয়েছিল ইদানিং?"

কর্ত্রী খানসামার দিকে তাকালেন। তার পরে বল্লেন—"শত্রুর কোনো খবর তো কখনো শুনি নি। বরং শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে উনি—"

"শত্রুতা না হোক—এমনি ঝগ্ড়া?" বাধা দিয়ে বল্লেন কলকেকাশি—"কারো সাথে তাঁর ঝগ্ড়াঝাঁটি হোতো কি আজকাল? পরিবারের মধ্যে কিংবা বাইরে?"

"পরিবারের মধ্যে? না, এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজী নই।" জানালেন মালিকের পরিবার।

"যে আজ্ঞে। এবার আমি তোমাকে একটা কথা শুধোব।" এই বলে কলকেকাশি খানসামার দিকে ফিরলেন: "আচ্ছা, বলতে পারো তুমি, সবার সঙ্গে আজকাল ওর সদ্ভাব ছিলো কেমন? আত্মীয়স্বজন কি আপিসের লোক—বন্ধুবান্ধব—অধীনস্থ কর্মচারী—কিম্বা চাকরবাকর—সকলেই কি ওঁকে বেশ ভালোবাসতো? পছন্দ করতো খুব?"

"আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।" জবাব দিলো খানসামা। —"মানে, আপনার ঐ চাকরবাকরের সম্পর্কেই।"

"আর, আপনার প্রশ্নের প্রথম ভাগের—মানে, আত্মীয়-স্বজনের বিষয়ে জানাতে আমার আপত্তি আছে।" জানালেন কর্ত্রী।

"বহুৎ আচ্ছা!—এইবার আপনাদের পাচক ঠাকুরকে ডাক দিন তো! তাকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"ঠাকুরকে ডাকো।" কর্ত্রী হুকুম দিলেন খানসামাকে।

ঠাকুর এলো। উড়িষ্যাজাত নয়, বাঙালী ঠাকুর। ভীত ভাব এলো। খবরটা সে পেয়েছিল আগেই।

"এসো। ভয় নেই, একটা কি দুটো কথা শুধোবো খালি তোমায়। কর্তার জলখাবার রোজকার মত আজও কি তুমিই বানিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ঐ অম্‌লেট তাহলে তোমারই তৈরী? অম্‌লেট বানাতে রোজ যা যা মশলা দাও আজও তাই সব দিয়েছিলে তো?"

রাঁধুনির মুখ শুকিয়ে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে সে জানালো—"যখন কথাটা আপনি তুললেন তখন বলি। আজকের অম্‌লেট বানাতে গিয়ে একটু গড়বড় হয়েছিল—তা—সেটা আমি তক্ষুনি—তারপরেই শুধরে নিয়েছি।' সঙ্গে সঙ্গেই।"

"গড়বড় কী, জানতে পারি?" কলকেকাশি শুধোলেন।

"ডিম-গোলাটায় প্যাঁজের—টম্যাটোর কুচি ইত্যাদি দিয়ে তারপরে নুন দিলাম। নুন দেবার পর আমার হুঁস্ হোলো নুন মনে করে যে সাদা গুঁড়োটা ডিমের গোলায় দিয়েছি সেটা নুন নয়। নুনের পাত্র তাকে তোলাই রয়েছে—তেমনিই! আমার নজরে পড়লো তখন।"

"বটে? ঐ সাদা গুঁড়োটা তাহলে কী বস্তু?"

"তা আমি বলতে পারবো না। রান্নাঘরের তাকে কে যে ওটাকে রেখেছিলো তাও আমি জানিনে। ও-জিনিস এর আগে আর কখনো আমি ওখানে দেখিনি।"

"হুম্! বুঝতে পারছি।" হুঙ্কার দিয়ে কলকেকাশি বেশ একটু গুম্ হয়ে গেলেন।

ঠাকুর ঘাবড়ে গিয়ে বললো—"আমার কোনো কসুর নেই মশাই! অল্পদিন হোলো এখানকার কাজে লেগেছি। আর ঐ যে সাদা গুঁড়োটা—টের পাবা মাত্রই সেটুকু আমি চামচে করে ডিমগোলার ভেতর থেকে তুলে বাদ দিয়েছিলাম।"

"সেই সাদা গুড়োর একটু নমুনা আনো তো দেখি?"

ঠাকুর চলে গেল, এবং খানিক পরে একটা চামচেয় সাদা রঙের একটু গুঁড়ো হাতে করে ফিরে এলো।

"এই সেই সাদা গুড়ো? দেখি!" কলকেকাশি জিনিসটা শুঁকলেন। তারপরে লালা-রসে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে সেটা গুঁড়োর মধ্যে বুড়োলেন। তারপরে আঙুলটা গালে দিলেন। নিজের গালে। জিভ দিয়ে পরখ করার পর অর্থপূর্ণ চাহনিতে তিনি তাকালেন গৃহকর্ত্রীর দিকে।

"হ্যাঁ, পুলিশ ডাকতে হয় এবার।" বল্লেন কলকেকাশি: "ফোনটা কোন ঘরে?"

"আপনি—আপনি নিশ্চয় আমাকে—" বলতে গিয়ে ঠাকুরের গলা বেধে যায়।—"আমাকে সন্দেহ করছেন

না?" এ ব্যাপারে নিজে বেধে যাবার ভয়ে সে কাঁপতে থাকে সেও এক গলা-বাধা ব্যাপার—ফাঁসীকাঠে।

নিমকের হারামি!

"যথা সময়ে জানবে।" জানালেন কলকেকাশি: "এখন তুমি যেতে পারো!"

তারপরে খানসামাকে হুকুম করলেন: "থানায় ফোন করে দাও।"

খানসামা চলে গেলে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন একটু—"বেশ শীত পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীত, কী বলেন ?"

"বলতে পারিনে ঠিক।" বল্লেন গিন্নী। তাঁকে বেশ ভাবিতই দেখা যায়।

পুলিস এসে পড়লো দেখতে না দেখতে। সদলবলে থানার দারোগা স্বয়ং এসেছেন। খানসামাই আগু বাড়িয়ে নিয়ে এলো তাঁদের।

ঘরে ঢুকে সব আগে লাশটা নজরে পড়লো দারোগার। সেটা তখনো সেখানে ছিল। সেইরকম শুয়ে, একটুও এপাশ ওপাশ করেনি।

তার পরে তিনি কলকেকাশিকে দেখতে পেলেন—"এই যে, আপনি! আপনি দেখছি এর মধ্যেই এসে গেছেন।"

"আসতেই হয়।" কলকেকাশি হাসলেন।

দারোগা বাবু ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করলেন, তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"খুন। বলাই বাহুল্য!"

"আপনার মতে আমি সায় দিতে পারলাম না।' কলকেকাশি দুঃখের সহিত জানালেন।"—যদিও দিতে পারলে খুব সুখী হতাম।"

"পারবেন না. সেটা জানা কথা। বেসরকারী গোয়েন্দারা কদাচই সরকারী পুলিসের সঙ্গে একমত হয়।"

"আজ্ঞে হ্যা। সব ডিটেকটিভ বইয়েই সেই কথা লেখে।" খানসামাও না বলে পারে না।

"আপনি যে বললেন খুন নয় তার কোনো সূত্র আপনি পেয়েছেন ?" দারোগা শুধোলেন।

"পেয়েছি বই কি। ঐ দেখুন।—ঐ সূত্র।" কলকেকাশি দেখালেন।

লাশটা যেখানে পড়েছিল ঠিক তার ওপরেই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে জড়ানো একটা মিশকালো মোটা সুতো। সুতোটা ফ্যানের ডাণ্ডার সাথে শক্ত করে বাঁধা।

কলকেকাশি চেয়ারের ওপরে খাড়া হয়ে চাকু দিয়ে ঝোঝুল্যমান সুতোর খানিকটা কেটে আনলেন—"দেখুন, এটা সাধারণ সুতো নয়। টোন সুতোর মতই দেখতে, কিন্তু তাও না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বানানো এক বিশেষ ধরণের সুতো এ। অত্যন্ত মজবুত। খুব ভারী জিনিসও অক্লেশে বহন করবার ক্ষমতা এর আছে।"

"থাকলোই বা, তাতে কি ? এটাকে আত্মহত্যা বলে যদিই বা মানা যায়, তার সঙ্গে এই সুতোর কী সম্বন্ধ আমি বুঝতে পারছি না।" দারোগা মাথা নাড়লেন।—"আমার মনে হয় টেবিলের ঐ খাবারের সঙ্গেই এই ব্যাপারের যোগাযোগ আছে। ঐ ভুক্তাবশেষের রাসায়নিক পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কিছুই বলা যায় না।"

"ঠাকুর যে ওঁকে বিষ দেয়নি তা কি আপনি ঠিক জানেন ?" জিজ্ঞেস করলেন গিন্নী : "লোকটা নতুন। অল্প দিন হোলো

বহাল হয়েছে, আর তার আজকের আচরণটাও যেন কেমন কেমন! বেশ সন্দেহজনক।"

"একটু ভয় খাওয়া। এই কথাই বলছেন?" বল্লেন কলকেকাশি: "তা, এরকম একটা কাণ্ড ঘটলে আশপাশের সকলেই একটু ভয় খায়। সে কিচ্ছু না।"

"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, কর্তা নিজেই ঐ সাদা গুঁড়োর পাত্রটা রান্নাঘরের তাকে রাখেন নি? যাতে কিনা ঠাকুর ভুল করে নুনের সঙ্গে গুলিয়ে—" খানসামাও নিজের গোয়েন্দাগিরির বিদ্যা জাহির করতে চায়।—"তাঁকে খুন করে বসে?"

"অথবা আপাতদৃষ্টিতে এটা খুন মনে হলেও—খুনের ছলনায় আসলে আত্মহত্যাই। ঠাকুরের হাত দিয়ে কর্তা নিজেকে মারতে চেয়েছেন? কিন্তু না, তা নয়।"

"তাহ'লে ঐ সাদা গুঁড়োটা?" জানতে চাইলেন গিন্নী।

"সোডি-বাইকার্ব। মনে হয়, হজমের ওঁর গোলমাল ছিল। মাঝে মাঝে ওটা খেতেন। কিন্তু ও খেলে মানুষ মরে না।"

"তাহলে মৃত্যুর কারণ?" দারোগার প্রশ্ন হয় এবার—"আত্মহত্যার আর কী সূত্র আপনি পেয়েছেন শুনি?"

"ঐ যে, সিলিং ফ্যানে লটকানো। ঐ একটি সূত্র। কিন্তু ওই সূতোই সব নয়। তার সঙ্গে এই চিরকুটটা পড়ুন।" কলকেকাশি তাঁর পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন। বের করে একটু মুচকি হাসলেন তিনি: "এইবার

ঐ সূতোর সঙ্গে এই চিঠি মিলিয়ে পড়ুন—দুয়ে দুয়ে যোগ করুন। এই প্রাণবিয়োগের রহস্য পরিষ্কার হবে।"

দারোগা বাবু চিরকুটখানা পড়লেন—"…ব্যাঙ্কের বিস্তর টাকা আমি তছরুপ করেছি। …এছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।…'

"আত্মহত্যাই মনে হচ্ছে।" দারোগাবাবু অবশেষে মানলেন: "কিন্তু তারও তো একটা প্রমাণ চাই মশাই! তারও সূত্র দরকার।"

"ঐ যে—ঐ সূত্র! পাখার থেকে ঝুলচে! সূত্রটি খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু দেখতে সরু হলে কি হবে, কাছির দড়ির মতই লাগ্‌সই। বেশ একজন ভারিক্কী মানুষেরও এর ওপরে নির্ভর করে দুর্গা বলে ঝুলে পড়বার বাধা নেই—"

"কিন্তু এ তো ছিন্ন সূত্র—" দারোগাবাবু বাধা দিয়ে বলতে যান।

"হ্যাঁ, কিন্তু সূত্রের সবটা নয়। ভিন্ন সূত্রও আছে। ওর বাকী আধখানা ভদ্রলোকের গলায় পাবেন। জামার তলায়। কোটের কলার তুলে দেখুন।"

———

টিকটিকির লেজের দিক

হুঁকাকাশি একজন নামজাদা গোয়েন্দা। আমাদের কল্কেকাশি তাঁরই ভায়রাভাই। তপ্ত কল্কের মত গন্‌গনে আর কাশির মতই খন্‌খনে তাঁর দাপট—নামডাকও তাঁর ভায়রার চেয়ে কিছু কম যায় না।

হ্যাঁ টিকটিকিহিসেবে তিনিও কিছু কম নন। অনেক খুনের তিনি কিনারা করেছেন—খুনীর কিনারে না গিয়েও। কতো ডাকাতকে তিনি কাত করেছেন, চোরকে ছেঁচড়ে এনেছেন—দেখতে না দেখতে। কতো রাহাজানির সুরাহা করেছেন—জানাজানি হয়ে পড়ার আগেই।

বদ্‌লোক একপলক তাকালেই তিনি টের পান। তাঁর চোখের সামনে সমস্ত পরিষ্কার। যাবতীয় রহস্য, সব কিছুর হদিস্। সরকারী পুলিস যেসব তথ্যের থই পায় না, থ হয়ে থাকে, শেষপর্যন্ত তাঁর কাছেই আসতে হয় তাদের। আর তিনি, সখের গোয়েন্দা হলেও, সখ্যের খাতিরে, জলের মত তাদের যতো সমস্যা সমাধান করে দেন।

এহেন ডিটেক্‌টিভ্ কল্কেকাশি এইমাত্র গোলদীঘিতে এসে বসেছেন। কোনো গোলমালের খোঁজে নয়, হাওয়া খাওয়ার খেয়ালে। মির্জাপুরের মোড়ে তাঁর টু-সীটারে চাবি মেরে, এখানে এসে একটু বিশ্রাম করবেন এখন।

বেঞ্চে তাঁর অদূরে বসে আধময়লা জামাকাপড়ে আধাবয়সী এক ভদ্রলোক। একমনে কী যেন ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে

উঠে গেল লোকটা। দীঘির কোণের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। লোকটা উঠে যেতেই এক ছোক্‌রা এসে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করল। ধপ্‌ করে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে সে বল্‌লে—ধূত্তোর!

বিরক্তিব্যঞ্জক তার ঐ অর্ধস্ফুট আর্তনাদের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে কল্কেকাশি কান না দিয়ে পারলেন না।

"তুমি কি কোনো মুস্কিলে পড়েছো?" তিনি জিগেস করলেন ছেলেটিকে।

"মুস্কিল বলে!" বল্‌লো ছেলেটিঃ "যা মুস্কিলে পড়েছি মশাই, এমন অবস্থায় পড়লে মানুষ পাগল হয়ে যায়!"

"কী হয়েছে শুনি তো?"

"শুনবেন আপনি? এমন বিপদে মানুষ পড়ে! শুনুন তাহলে। পশ্চিম থেকে আজ দুপুরে এসে নেমেছি কলকাতায়। চেনা এক বন্ধুর বাড়ী উঠবো এই স্থির। বছর দুই আগে আরেকবার যখন এসেছিলাম তাদের বাড়ীতেই ছিলাম। আজ সেখানে গিয়ে দেখি, এই তো খানিক আগেই মশাই! কোথায় সেই বাড়ী, কোথায় বা কি! বন্ধুরও কোনো পাত্তা নেই একদম্‌।"

"বলো কি হে? খুনটুন করে হাওয়া নাকি—তোমার সেই বন্ধুটি?" কল্কেকাশি উচ্চকিত হনঃ "কিন্তু বাড়ী? বাড়ী নেই? বাড়ী অব্দি লোপাট?"

বাড়ীর পলায়ন কল্কেকাশির কাছে ভালো ঠেকল না। একটু যেন বাড়াবাড়িই মনে হোলো। মানুষ ফেরেব্‌বাজ হতে পারে, কিন্তু বাড়ী কেন ফেরার হবে? বাড়ীর তো ফাঁসী হয় না, তার পালাবার কী প্রয়োজন ছিল? অ্যাঁ?

"না না, তা কি করে হতে পারে!" তিনি বল্লেন: বাড়ী ঠিকই আছে। কোথাও যায় নি, যেতে পারে না। বাড়ী হচ্ছে ফেরার জায়গা, বাড়ী কি ফেরার হতে পারে? তুমি ভালো করে খুঁজে ছাখো গে।"

"খুঁজতে কি আর বাকী রেখেছি মশাই? খুঁজবার কোনো কসুর করিনি।" যুবকটি জানায়: "কিন্তু খুঁজে আর কী হবে? যেখানে বন্ধুর বাড়ী ছিল সেখানে সিনেমা হাউস হচ্ছে, নিজের চোখেই দেখে এলাম।...আপনি কি এর পরেও খুঁজতে বলেন?" সে জানতে চায়।

"হ্যাঁ, এরকম প্রায়ই ঘটে থাকে বটে।" কল্কেকাশি আঁচ পান এতক্ষণে: "আজ যেখানে ছিল চায়ের দোকান, কাল সেখানে ডাইং ক্লিনিং। আজ যেখানে চুল ছাঁটার সেলুন, কাল সেখানে দেখবে রেঁস্তরা। কাঁচির খচ্‌খচানির জায়গায় কাঁটা চামচের ঠনৎকার! আসল ব্যাঙ্ক ভেবে আজ যেখানে তোমার টাকা রাখলে কাল দেখবে, আসলে সেটা রিভারব্যাঙ্ক ছাড়া কিছু না। তোমার যথাসর্বস্বই জলাঞ্জলি। যে যা পাচ্ছে, যাকে পাচ্ছে, যেখানে পাচ্ছে, মেরে ধরে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ছে—আকৃচারই তো দেখা যায়।

তুমি এক কাজ, করো, ভালো একটা হোটেল দেখে ওঠো গে।"

"উঠেছিলাম তো। ট্যাক্সি ড্রাইভারই তার জানা এক হোটেলে আমাকে তুলে দিলো। আমার ঘরে ব্যাগ সুটকেস্ বিছানা পত্তর সব রেখে আমি একটা টুথ্‌পেষ্ট কিনতে বেরিয়েছি—তারপর—তারপর আর কী বলব? সেই হোটেলটা খুঁজে পাচ্ছিনে এখন আর।"

"হোটেলের নাম?" কঙ্কেকাশি জিগেস করলেন।

"তাই তো মনে পড়ছে না মশাই, নাম মনে থাকলে তো হোতোই। তাহলে আর মুস্কিল কিসের?"

"এ আর মুস্কিল কি? এই গোলদীঘির আশপাশ—হ্যারিসন রোড্, মির্জাপুর, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্—সব হোটেলে ভর্তি। এইখানেই যতো রাজ্যের হোটেল আর বোর্ডিং হাউস্। তবে একটা তো হোটেল না, একটু ঘুরতে হবে তোমায়—এই যা। বাড়ীটা দেখলে তো চিনতে পারবে?"

"সেইখানেই তো গোল মশাই! কি রঙের, কোন্ ঢঙের, কি রকমের, কেমন চেহারার কতালা বাড়ী—কিছুই ভালো করে দেখেনি। কাছে পিঠেই একটা টুথ্‌পেষ্ট কিনবো, কিনেই ফিরে আসবো—ভালো করে চিনে রাখবার দরকারও মনে করিনি কিছু—"

"এখন দেখছ সব চিনেম্যান্—কাউকেই চেনা যাচ্ছে না—কী বলো?"

"তারপর এ-দোকান সে-দোকান করতে করতে কখন্ রাস্তা টাস্তা সব গুলিয়ে গিয়েছে—"

"তাহলে ভো গোল বাধিয়েছো সত্যিই!...বেশ একখানা গোল বাধিয়ে এই গোলদীঘিতে এসে আমাকে বাধিত করেছো!" শেষের বাক্যটি কল্কেকাশি আর প্রকাশ করেন না—নিজের মনেই বলেন।

খুনখারাপির কিনারায় ওস্তাদ কল্কেকাশির বাড়ী খুঁজতে বেরুবার সাধ হয় না। গোরু খোঁজা আর বাড়ী খোঁজায় কার উৎসাহ হয়? তার ওপরে, গোরুর জন্য বাড়ী খুঁজতে হলেই তো হয়েছে!

"আরো মুস্কিল, বাড়ীটা তো চিনে রাখিই নি—" ছেলেটি বলতে থাকে: "তারপরে কোন্ রাস্তায় যে তাও জানা নেই—অথচ আমার জিনিসপত্র সব—সেই হোটেলেই রয়ে গেছে। টাকাকড়ি যা কিছু।...এখন কী যে করি?"

"কী আর করবে? ফিরে যাও। যেখান থেকে এসেছো সেইখানেই ফেরৎ যাও পত্রপাঠ! নিজের বাড়ী ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কী করবার আছে এখন? তবে হ্যাঁ, কাছাকাছি থানায় একটা খবর দিয়ে যেতে পারো। পুলিস যদি তোমার হোটেল আর জিনিসপত্রের পাত্তা পায় তোমার দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।"

"তা না হয় গেলাম। থানায় খবর দিয়েই গেলাম নাহয়। দেশেই ফিরে গেলাম রাত্রের ট্রেনে। কিন্তু—কিন্তু—যাই কি করে? যেতে তো টাকা লাগবে, আর টাকা কই আমার?"

কঙ্কেকাশি এই তথ্য বহুক্ষণ আগেই জেনেছেন। তাঁর কাছে এ-সংবাদের কোনো নূতনত্ব ছিল না।

"আপনাকে—আপনি—আমাকে—" যুবকটি বাধা কাটিয়ে বলেই ফ্যালে অবশেষে: "আপনাকে সদাশয় ভদ্রলোক বলেই বোধ হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করে—বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দেন আমায়—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে আমি দিতাম—যদি তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হোতো। মুস্কিলটা কোথায় জানো? তোমার হোটেল হারানোয় নয়—টুথ্‌পেষ্ট কিনতে বেরুনোতেও না—" রূঢ় অপ্রিয় সত্যটা বলবেন কিনা তিনি ভাবেন।

"তাহলে?"

"মুস্কিল হয়েছে এই যে, সবই ঠিক, কিন্তু তুমি যে টুথ্‌পেষ্টটা কিনেছো সেইটেই কেবল দেখাতে পারছো না।"

কঙ্কেকাশি মৃদুমধুর হাসেন: "কাহিনীটা ফেঁদেছিলে খাসা! ওস্তাদ্ গল্পকারদের মতই—মন্দ না, কিন্তু তোমার প্লটের ঐখানটাতেই গলদ্ রয়ে গেছে। আসল জায়গাতেই কাঁচা হাতের ছাপ! সেইজন্যই ধরা পড়ে গেলে। বুঝতে পারছি, এখনো ততটা পাকা হয়ে উঠতে পারোনি, বালক!"

কঙ্কেকাশির অভিযোগ শুনেই ছেলেটি চম্‌কে যায়, জামার পকেটে হাত পুরে দেয় চট্ করে—আর তার পরেই সে লাফিয়ে ওঠে।

"কোথায় ফেললাম তাহলে ?" ককিয়ে ওঠে সে "আমার টুথ্‌পেষ্টটা হারালাম নাকি ?"

পকেট মাইনাস্‌ প্যাকেট !

"এক বিকেলের মধ্যে বন্ধুর বাড়ী, একটা হোটে আর এক প্যাকেট টুথ্‌পেষ্ট একসঙ্গে হারানো—বড় ক বাহাদুরি নয়।"...

কঙ্কেকাশি আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলেটি দাঁড়ায় না। তাঁর শানিত মন্তব্য শোনবার জন্য অপেক্ষা করে না সে। সবেগে সেখান থেকে চলে যায়।

"হ্যাঁ, বাহাদুরই তোমাকে বলতাম যদি শেষরক্ষা করতে পারতে। দেশ থেকে সদ্য ট্রেনে আসা, টুথপেষ্ট কিনতে বেরুনো, হোটেল হারিয়ে ফেলা সবই ঠিকঠাক হয়েছে—গল্পটা বানিয়েছো মন্দ না! বলেছোও বেশ গুছিয়ে—গড় গড় করে—কোথাও না একটুও আট্‌কে। সমস্তই নিখুঁত, কেবল ঐ সামান্য একটুখানি ত্রুটির জন্য সমস্ত ভেস্তে গেল। আরো একটু বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকে যদি আন্‌কোরা টুথপেষ্টের একটা চক্‌চকে প্যাকেট দোকানের ক্যাশ-মেমো সমেত নিজের পকেটে মজুৎ রাখতে—তাহলে বলতে কি, তোমাকে আমি উদীয়মান প্রতিভাই বলতাম। তোমার জন্যে তাহলে আর আমার ভাবনা ছিল না। নিজের লাইনেই তুমি করে খেতে পারতে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কঙ্কেকাশি বেঞ্চি ছেড়ে ওঠেন—আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নজরে কী যেন পড়ে। বেঞ্চির তলায়, মোড়কে মোড়া—লম্বাকৃতি—কী ওটা? টুথ্‌পেষ্টের প্যাকেট না? হাতে তুলে ভাখেন—তাইতো! টুথ্‌পেষ্টেই তো! দোকানের ক্যাশমেমো-জড়ানো—এখন কেনা যে তার কোনো ভুল নেই। বোঝা গেল, ছেলেটি যে সময় গা-ঝাড়া দিয়ে ধপ্‌ করে বসেছিল, সেই সময়েই এটা ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে টপ্‌কে ধরাশায়ী হয়েছে।

নাঃ, খুঁজে বার করতে হোলো ছেলেটাকে। একটু এদিকে ওদিক তাকাতেই, গোলদীঘির আরেক ধারে পাত্তা মিললো তার।

"ওহে শোনো শোনো!—" কল্কেকাশি তার কাছে গিয়ে ডাকলেন।

যুবকটি উদ্ধতভাবে ফিরে তাকালো।

"তোমার গল্পের প্রধান সাক্ষী এসে পৌচেছে।" এই বলে প্যাকেটটা তিনি তার হাতে তুলে দিলেন: "এই নাও তোমার পেইস্‌ট্। বেঞ্চির তলাতেই পড়েছিল। তুমি চলে আসার পর এটা চোখে পড়লো আমার। যাক্ গে··· যেতে দাও···তোমাকে অযথা সন্দেহ করেছি বলে কিছু মনে কোরো না। তোমার টাকার দরকার আছে বলছিলে···" এই বলে কল্কেকাশি তাঁর পকেট হাতড়ে নোটে টাকায় খুচরোয় যা ছিলো তার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—"টাকা বাইশ হবে। এদিয়ে তুমি দেশে যেতে পারবে। তারপর সেখান থেকে···এই নাও আমার কার্ড—এতে আমার নাম ধাম লেখা আছে···বাড়ী পৌঁছে—তারপর আমার টাকাটা মনিঅর্ডারে তোমার সুবিধামত ফেরৎ পাঠিয়ো। কেমন?"

"ভাগ্যিস্, টুথ্‌পেষ্টটা আপনি পেয়েছিলেন।" এই বলে ছেলেটি টাকাটা হাতে নিয়ে তো-তো করে কী যেন বললো —ধন্যবাদের ভাষাই হয়ত হবে—বলেই চোঁ চোঁ করে ছুট্‌লো। দেখতে না দেখতেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে।

ট্রেন ধরতেই ছুটেছে! কল্কেকাশি বল্লেন আপন মনে।

যাক্! তিনিও গোলদীঘিতে আর গোটা দুই চক্কর মেরে বাড়ী ফিরবেন। ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরপাক্ খাবার মুখে সেই ভূতপূর্ব বেঞ্চির কাছাকাছি আসতেই আরেক অভূতপূর্ব দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো। এক ব্যক্তি উদ্‌গ্রীব হয়ে অতি সতৃষ্ণদৃষ্টিতে বেঞ্চির নীচে, আশেপাশে, চারিধারে ভারী উঁকিঝুঁকি মারছে।

দেখবামাত্রই লোকটিকে তিনি চিনলেন। ছেলেটির আবির্ভাবের আগে এই লোকটিই বেঞ্চিতে তাঁর পাশে বসেছিল!

"আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি? কী খুঁজছেন অতো করে?"

"হ্যাঁ মশাই, এইমাত্র কেনা—" লোকটি আর্তকণ্ঠে জানায়: "একটা টুথ্‌পেষ্টের প্যাকেট।"

সামলাতে কষ্কেকাশির সময় লাগে। তিনি কিছু বলতে পারেন না। লোকটিই বলে যায়—"টুথ্‌পেষ্টের জন্য তত নয়, ওটা হারানোর জন্যেও না—কিন্তু ওর মধ্যে—ওই প্যাকেটের ভেতর—আমার আজকের পাওয়া মাইনে—পুরো এমাসের বেতন—"

"ক'খানা নোট ছিল?"

"আজ্ঞে, একখানা একশো টাকার আর ছটা দশটাকার নোট...এমাসের পুরো মাইনেটাই। ভারী পকেট মারে আজকাল, তাই ভাবলুম প্যাকেটের মধ্যে রাখলে টাকাটা নিরাপদে থাকবে—"

কাহিনীটার এপর্যন্ত এক বিখ্যাত লেখকের। তাঁর নাম সাকি—তাঁরই গল্পের ছায়ায় এটি লেখা! এখন, সাকির গল্পের বাকিটা।...

কেরানীটির কথা শুনে কঙ্কেকাশি গুম্ হয়ে গেলেন। বল্লেন, "হুঁ। বুঝেছি।...দেখুন, আপনার টাকাটা খোয়া যাবার জন্য আমিই দায়ী। আপনি এক কাজ করুন, চলুন আমার সঙ্গে—আমি আপনার ক্ষতিপূরণ করব। আমি অবিশ্যি কলকাতার বাইরে থাকি, ডায়মণ্ড হারবার রোডে—তা হলেও আমার বাড়ী খুব বেশী দূরে নয়। সঙ্গে আমার গাড়ী আছে। ফির্‌বার সময় বাস পাবেন।"

ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে কঙ্কেকাশির মোটর তীর-বেগে ছুটেছিল। সহর ছাড়িয়ে—সহরতলী পেরিয়ে—এক-টানা পীচ-ঢালা পথের বুকের ওপর দিয়ে। দুধারেই ফাঁকা নির্জ্জন রাস্তা—মাঝে মাঝে এক আধখানা বাড়ী। বাগান বাড়ীই বেশীর ভাগ।

কঙ্কেকাশি বেপরোয়া গাড়ী চালাচ্ছেন। কেরানীটি তাঁর পাশে বসে—চুপ্ চাপ্।

ভাবতে ভাবতে চলেছেন কঙ্কেকাশি। নাঃ, মানুষের রহস্য বোঝা দায়—জীবনের রহস্যের মতই তা জটিল। সব লোকের না হলেও, অন্ততঃ বদ্‌লোকদের আদি-অন্ত পেয়েছেন বলে নিজের সম্বন্ধে যে-উচ্চ ধারণা তাঁর ছিল সেই গর্ব বলে আজ তাঁর খর্ব হয়েছে। নাঃ, মানুষ চেনা বড্ডো কঠিন।

হঠাৎ কল্কেকাশির কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। পার্শ্ববর্তীর দিকে তিনি বারেক ভ্রূক্ষেপ করলেন। গোলদীঘির সেই যুবকটি নাহয় এক নম্বরের ঠক্‌, কিন্তু এই লোকটিই কি নির্ভ্যাজাল ?

সন্দেহ হতেই নিজের বাঁ পকেটে তিনি হাত পুরে দিলেন—হুম্‌, ঠিক ! ঠিকই তো। অবিকল—যা ভেবেছেন। তাঁর আকস্মিক সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

অমনি ডান পকেট্‌ থেকে তাঁর রিভলভার বার হয়ে এলো। (গোয়েন্দাদের পকেটে আর কিছু থাক্‌ বা না থাক্‌, পিস্তল আর হাতকড়া সর্বদাই লেগে থাকে)। লোকটির দিকে সেটি উঁচিয়ে তিনি বল্লেন—কই, ঘড়ি চেন সব বার করো দেখি।

লোকটিও অম্‌নি একটুও দেরি না করে নিজের পকেট থেকে ঘড়ি চেন বার করে দেয়। বিনাবাক্যব্যয়ে।

ঘড়ি চেন পকেটে পুরে হাতকড়ি বার করে কেরানীটির করযুগলে পরিয়ে দেন কল্কেকাশি। তারপরে মোটর থামিয়ে পথের মাঝখানেই নামিয়ে দেন বেচারাকে।

"দয়া করে তোমায় আর পুলিসে দিলাম না। এখান থেকে হাতকড়া-হাতে পায়ে হেঁটে বাড়ী যাও। এই তোমার যোগ্য শাস্তি। হ্যাঁ !"

হ্যাঁ, কে এখন এমন সময়ে থানাপুলিশ করে ? সে সবের হয়রানির চেয়েও এই ভালো ! এর শয়তানির ঢের সাজা দেয়া হয়েছে। এখান থেকে কলকেতা—এতখানি পথ

করজোড়ে আর জোর করে কাউকে হাঁটানো কম শাস্তি নয়।

তাছাড়া, তাঁর মত ধুরন্ধর গোয়েন্দার ট্যাঁক থেকেও ঘড়ি চেন চুরি যায়—নিজের এত বড়ো বাহাদুরির পরিচয় থানাপুলিসে কোন্ মুখে তিনি জানাবেন? এখবর গোয়েন্দা মহলে জানাজানি হয় এমন ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

"যেমন কর্ম তেমনি ফল! মরুক্ গে ব্যাটা সারা রাস্তা নিজের সঙ্গে হাতাহাতি করে!" এই বলে তিনি আরো জোরে গাড়ী চালিয়ে দিলেন। থামলেন এসে সটাং নিজের বাড়ীতে।

বাড়ীর ভেতরে পা না বাড়াতেই তাঁর ছোট ছেলে ছুটে এলো—"বাবা, বাবা! তোমার চেন্ঘড়িটা তুমি আজ নিয়ে যাওনি যে? টেবিলের ওপরে ফেলে রেখে গেছ। হাতে পেয়ে ওটাকে আজ আমি ভালো করে সারিয়ে রেখেছি। তুমি তো বলো যে ভালো ঘড়ি নাকি আরো ভালো করা যায় না। কিন্তু কেমন মেরামত করেছি দেখবে এসো একবার। সারিয়ে টারিয়ে ঢাক্নি টাক্নি সব এঁটে দিয়েছি তেমনি করে! কেবল একটা সুতোর মতন সরু তার—তালগোলপাকানো কিন্তু বেশ লম্বা—সেইটেই যা গোল করেছে! সেটাকে কিছুতেই আর ভেতরে আঁটানো গেল না। তা না যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। কাঁটা টাটা সব তোমার ঠিকঠাক আছে।"

একটি ঘোড়ার জীবন চরিত

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কী করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা নইলে হয়ত সে একটা অশ্বমেধ-যজ্ঞই করে বসত। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে ত অধর্ম করে অমনি মারা যায় না। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কিনা তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

মনে মনে সে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্বতো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা, ঘোড়ারও তাই,—সবদিকেই মিল আছে, যা কিছু তফাৎ তা কেবল ল্যাজের আর আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধ্বাভাবে গুড়ং দত্যাৎ, তখন—পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দত্যাতের বিধানও কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এককালে ঘোড়াটা অবশ্যি খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অব্দি আজকাল কোনো কাজে লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকাই একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, নতুন ছাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকারী চিঠি, কখন কী খায় স্থির নেই। সেদিন তো কাশ্মিরী শালের

আধখানাই সাবাড় করলো। তাছাড়া রান্নাঘরের দিকেও ওর নজর আছে বেশ।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুরমত প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক্‌ছোঁ্যাক্‌ আওয়াজ কিম্বা বেগুণভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ের মেটে বাড়ী পঞ্চাননের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নীর কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুন-ভাজা না দিয়ে? বেগুনভাজার প্রতি পঞ্চাননেরো দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যই সে পেটভরে বেগুন-ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নী বেগুন না ভেজে, বোধহয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মৎলবেই, বেসন দিয়ে বেগুণী ভাজছিলেন। গন্ধ পাবামাত্র ঘোড়াটা সেইখানে হাজির। দু'একবার সে গিন্নীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চিঁহি চিঁহি।

সংস্কৃত ভাষায় তার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নী কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে পাত করে ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুণী আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে সুরু করে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি পঞ্চাননের আর চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে সে—ভাটাপাড়া যাবেই।

গিন্নীকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে অমনি করে আস্কারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই

একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ওকে খুন করে যদি ফাঁসি যেতে হয় সেওভি আচ্ছা। ঘোড়াটা কিন্তু
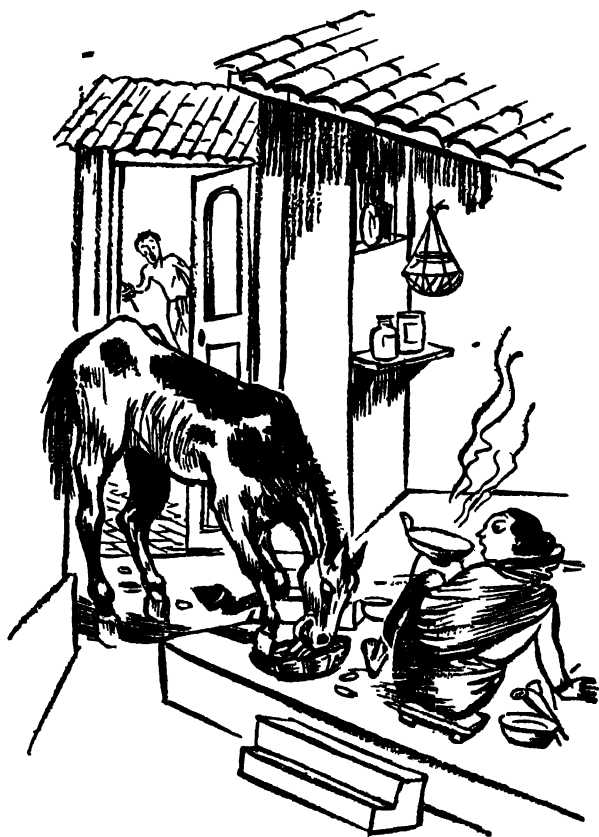
বেগুনিখোর ঘোড়া !

গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে। সুবোধ বালকের মত সব খায়।

তারপরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য-আনানো

পঞ্চাননের টর্চ-বাতিটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে যখন টের পেল যে ওটা ঠিক বেগুণী নয় তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন ত রেগে টং! সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি !

সত্যি, টর্চ লাইটের এমন টর্চার ভাবাও যায় না। ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে—চিঁ হি হি! অর্থাৎ —যা বলো তুমি !

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্যে কী সাজা ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল,—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না। জব্দ হবে খুব।

পঞ্চানন কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজন করছে—মেয়ে রাধারাণী ছুটে এসে বল্‌ল, বাবা করছো কি! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারীর মধ্যে এসে ঢুক্‌বে যে !

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, হ্যাঁ, সে একটা ভাবনার কথা বটে। ঘোড়াটার যেরকম বুদ্ধি-শুদ্ধি আর যেরূপ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, তাতে ওর পক্ষে সবই সম্ভব। মশারীর মধ্যে ঢোকা কি, ওদের পাশে শুয়ে পড়াও কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।— সটাংএবং পটাং।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত।

"কিহে পঞ্চানন, কী হচ্ছে ? কাঁচি কেন হাতে ?"

"এস ভাই, এই ট্রেন্ করছি ঘোড়াটকে।"

"তুমি হর্স-ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে হে ?"

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে—আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

"তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছ। আমাদের পাড়াই মাড়াও না আর। দুবছর থেকে দেখা নেই—ব্যাপার কি ?"

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল—কিসের দেনা ?

"সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলুম বটে। মনে ছিল না ভাই।"

জ্যোতিষ বোস্ ছেলেবেলা থেকেই বেশ হিসেবী, একথা পঞ্চানন জানত। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এতবেশি হিসেবী হয়ে উঠবে যে চার আনা পয়সার কথা দু বছর ধরে মনে করে রেখে ভিন্ গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাবা পাঁচশো টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন ভারী অবাক্ হোলো।

"তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হোলো তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে, নিজে

গিয়ে দেখতে পারো একদিন। এইবার একটু গা করে ওটা দিয়ে দাও।"

"কী যে বলো তুমি! সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এতদূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে! রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা পয়সা চেয়ে আন্ তো। আর বল্‌গে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুণী ভাজতে। বেগুণী দিয়ে আচারের তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ হে! তার সঙ্গে কাঁচা-লঙ্কা!"

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বল্‌ল—তা হবেখন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই ভাই।

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বল্‌ল—চার আনা নেই কি রকম? তার মানে?

"আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও নাহয় আমায়।"

য়্যাঁ? পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই—কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কি সহজ তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা

ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়েসের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা কে জানত? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠহাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো আর জলে পড়বে না। বোসো, জিরোও, গল্প করো। অনেকদিন পরে দেখা।

"হ্যাঁ, বসব বই কি! বেগুণীও খাব! কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো?"

পঞ্চানন মনে মনে মৎলব এঁটে বলে—এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এতটা পরিশ্রম কি ভালো তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখো না কেন হে? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও বটে। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে কটাক্ষপাত করে জবাব দেয়—বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেকদিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই এ বয়সে আর হাঁটা-চলা পোষায় না! কিন্তু মনের মত ঘোড়া পাই কোথায়?

"কিরকম মনের মত শুনি?"

"এই ধরো খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড় গোড় আর আস্ত থাকবে?"

"তা সেরকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায়? কিনে শিখিয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটাই কি কম তেজী ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপো, তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এত বিনয়ী, এরূপ নম্রস্বভাব—মানে, সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়ার।"

"তা ভাই, তোমার ঘোড়াটির মত অমন উচ্চশিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায়? আমি ত আর তোমার মত ট্রেনার নই। তা তোমার ঘোড়াটি কতয় কিনেছিলে?"

"দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মাত্তর পনের টাকায়।"

"তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকায় ঘোড়াটা আমায় দাও। তোমার এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই ধরো, একটা দশ টাকার নোট।"

"না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।"

"আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে।"

পঞ্চানন তবুও তেমন গা করে না।

"ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ নাই করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে দ্যাখো, পৌনে তিন পাই যোগাড় করা তোমার পক্ষে শক্ত হত নাকি?"

পঞ্চানন হাসি চেপে আমৃতা আমৃতা করে বলে—তা

তুমি যখন এত করে বল্‌ছো। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম নাহয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

"ভালোই হোলো। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলুম পথে ত তোমার বাড়ী পড়বে, দেখা করে নিয়ে যাই টাকাটা। তা ভালোই করেছি। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতো ?"

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত আর শান্ত ঘোড়া দেখা যায় না প্রায়। পঞ্চানন যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। হাঁটছে বলে মনেই হয় না। অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুসী। নিঃশ্বাস ফেলে বলে—বাঁচা গেল এতদিনে। আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ থোক্ লাভ। অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলুম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তা। নইলে পৌণে তিন পাই জোগাড় করা বেজায় শক্ত হোতো।

কেবল গিন্নী একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন—খেতে পেত না বেচারা, তাই অমন ছোঁ ছোঁ করত! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কী খায়—সেসব ও চোখেও দেখেনি কখনও। টর্চ খাবে, বেগুণী খেতে চাইবে তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালায় মানুষ ঘাস খায়!

পঞ্চানন বল্‌ল—তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে।

জ্যোতিষরা বড়লোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ী। আমরা গরীব মানুষ, নিজেদেরই দানা পাইনে, কোথায় পাব ঘোড়ার দানা !

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার পাঁচ গুণ সময় লাগলো জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারি খুসী। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু বেগ পেতে হয়েছে। ওঠার সময় টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাৎ হোলো না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া আর কিছু না হোক অন্ততঃ অবনত হতে শিখেছে। নিশ্চয় তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝলে তাঁর ইঙ্গিত, না দিল কান তাঁর সাধ্য সাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই, লাফিয়ে নামতে হোলো, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি কিম্বা একটুও তিনি জখম্ হন নি। চড়াই উৎরাই দুই তাঁর নির্বিঘ্নে হয়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই খাতির ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি হ্যালো মিষ্টার বোস্ বলে তাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে পাঠিয়ে দেবার হুকুম হোলো আর্দালির ওপর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আর জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময়ে আস্তাবল থেকে বিরাট এক আওয়াজ এল—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁ!

কী ব্যাপার? ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুজনেই চম্‌কে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এরকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনও শোনেননি। কোনো ঘোড়ার মুখ থেকে নয়। এমন কি, যে ডার্বি জিতেছে, সেও এহেন উচ্চধ্বনি করে না। দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবল করছে—চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ!

ঘোড়ার সামনে দুবাল্‌তি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা তো স্পর্শও করেনি। সে বোধহয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বাল্‌তির দিকে তাকাচ্ছে আর তার ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে উঠছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যায় সবাই সেই ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি দারুণ হাসি—তা থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হোলো না কাউকেই।

হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোড়াটা মারা গেল।

হাতীমার্কা বাতিক

কাকার হোলো হাতীর বাতিক শেষটায়।

সংগ্রহ করার 'হবি' আগে কখনো ছিল না কাকার। কেবল এক টাকা ছাড়া। কিন্তু টাকা এমন জিনিস যে যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হলে আপনিই অনেক গ্রহ এসে জোটে। আর তখন থেকেই সংগ্রহ সুরু।

একদিন ওই গ্রহদের একজন কাকাকে বললে, দেখুন, সব বড় লোকেরই একটা না একটা কিছু সংগ্রহ করার ঝোঁক আছে। তা না হলে আর বড়লোক কী? বড়লোক আর বড়লোকে তফাৎ কোথায়? টাকায় তো নেই। ওইখানেই তফাৎ। ওখানেই বিশেষ বড়লোকের বিশেষত্ব। আর বৈশিষ্ট্যই যদি না থাকলো তবে বড়লোক কিসের? তবে আর শিষ্টসমাজে থাকা কেন? আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জেরও কলেক্‌সনের হবি ছিল।

কাকা বিস্মিত হয়ে গ্রহের পানে তাকান—পঞ্চম জর্জও?

"নিশ্চয়! কেন, তিনি কি বড়লোক ছিলেন না? কেবল সম্রাটই নন, দারুণ বড়লোকও ছিলেন যে! অনেকগুলো জমিদারকেই এক সঙ্গে কিনতে পারতেন তিনি।"

"ও! তাই বুঝি তাঁর জমিদার-সংগ্রহ করার বাতিক ছিল?" কাকা আরও অবাক হন।

"উঁহুঁহু। জমিদার নিয়ে রাখবেন তিনি কোথায়? ও তো চিড়িয়াখানায় রাখা যায় না। তিনি কেবল ষ্ট্যাম্প কলেক্ট করতেন—"

"ইস্‌ট্যাম্পো ? ওই যা পোষ্টাপিসে পাওয়া যায় ? না—দলিল—টলিলের ?"

"দলিলের নয় ! নানা দেশের নানা রাজ্যের ডাকটিকিট, একশো বছর আগের, তার আগের, তারো আগের—তারো পরের—এম্‌নি নানান্‌ কালের, নানা আকারের, রঙ বেরঙের যতো ডাক টিকিট।"

"বাঃ, বেশত !" কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—'আমারও তা করতে ক্ষতি কি ?"

"কিছু না ! তবে এক একটা পুরোণো টিকিটের দাম আছে বেশ ! দু'পাঁচ টাকা থেকে সুরু করে দু পাঁচ দশ বিশ হাজার দু'লাখ চার লাখ পর্যন্ত।"

"য়্যাঁ, এমন ?" কাকা কিছুটা ভড়্‌কে যান : "তাহোক, তবুও করতেই হবে আমায়। টাকার ক্ষতি কি আবার একটা ক্ষতি নাকি ?"

"নিশ্চয় নয়। তবে আর বড়লোক বলেছে কেন ?" এই বলে গ্রহটি উপসংহার করে। এবং আমার কাকাকেও প্রায় সংহার করে আনে।

কাকা ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করছেন এ খবর রটতে বাকি থাকে না। পঞ্চাশখানা য়্যাল্‌বাম্‌ যখন প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন তখন একদিন সকালে উঠে গ্যাখেন বাড়ীর সামনে পাঁচশো ছেলে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কী ? জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সবাই ওরা এসেছে কাকার কাছেই—কেউ ষ্ট্যাম্প বেচতে, কেউ বা কিন্‌তে। সকলের হাতেই ষ্ট্যাম্পের য়্যালবাম্‌।

কাকা তখনই গ্রহকে ডেকে পাঠান, "একি কাণ্ড? এরাও সব ইস্ট্যাম্পো সংগ্রহ করছে যে? আর করছে বলে করছে! অনেক দিন ধরে করছে—আমার ঢের আগে থেকেই। এ কী ব্যাপার?"

"কী হয়েছে তাকে?" গ্রহটি ভয়ে ভয়ে বলে, কাকার ভাবভঙ্গী তাকে ভীত করে তুলেছে তখন—"কেন, ওদের কি করতে নেই?"

"সবাই যা করছে, পাড়ার পঁচকে ছোঁড়াটা পর্যন্ত—" কাকা ফেটে পড়েন এবার, "আমাকে তুমি লাগিয়েছ সেই কাজে? ছ্যা! কেন, এরাও কি সব বড়লোক?"

তারপর তিনি আফসোস করতে থাকেন, ইস্ট্যাম্পের আমার দশ হাজার টাকা তুমি জলে দিলে!—ছ্যা!

গ্রহ আর কি জবাব দেবে, সে তখন বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। তিত-বিরক্ত কাকা নিজের যত য়্যালবাম্ খুলে ছিঁড়ে ছড়িয়ে চ্যাঙরাদের মধ্যে ষ্ট্যাম্পের হরি লুট লাগিয়ে দ্যান্, সেই দণ্ডেই!

কিন্তু ষ্ট্যাম্প ছাড়লেও বাতিক তাঁকে ছাড়ল না। বাতিক জিনিষটা প্রায় বাতের মতই, একবার ধরলে ছাড়ানো দায়। তিনি বল্লেন, ইস্ট্যাম্পো টিস্ট্যাম্পো নয়—এমন জিনিস সংগ্রহ করতে হবে যা কেউ করে না, করতেও পারে না। সেইরকম কিছু থাকে তো দ্যাখো তোমরা।

তখন নবগ্রহ মিলে মাথা ঘামাতে সুরু করলো, তাদের প্রেরণায়, তাদেরই, আরো নব্বই জন উপগ্রহের মাথাও ঘামতে

লাগলো! নতুন হবিদের খুঁজে বের করতে হবে—রীতিমত বুদ্ধি খাটিয়ে।

নানারকমের প্রস্তাব হয়। খেচরের ভেতর থেকে প্রজাপতি, পাখীর পালক; জলচরের ভেতর থেকে রঙিন মাছ, তিমির হাড়, কচ্ছপের খোলা; ভূচরের ভেতর থেকে পুরোনো আস্‌বাব-পত্র, সেকেলে ঢালতলোয়ার, শিলালিপি; তাম্রলিপি, হাতপাভাঙা মূর্তি; নানাচরের মধ্যে চীনে বাসন, গরুর গলার ঘণ্টা, রঙ বেরঙের নুড়ি, রাজ্যের খ্যাল্‌না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাকা সমস্তই বাতিল করে দ্যান্‌। সকলেই পারে সংগ্রহ করতে এসব।

তখন পকেটচরদের উল্লেখ হয়। নানাদেশের একালের সেকালের আস্‌রফি মোহর টাকা পয়সা সিকি দুয়ানি প্রভৃতি। ফাউন্টেনপেন দেশলায়ের বাক্সও পকেটচরের মধ্যে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু কাকাকে রাজি করানো যায় না। কেউ না কেউ করেছেই এসব, তাঁর জন্যে ফেলে রাখেনি নিশ্চয়।

কেউ কেউ মরীয়া হয়ে বলে—কেরোসিনের ক্যানাস্তারা, নস্যির ডিবে, জগঝম্প কিংবা গাঁজার কল্কে অর্থাৎ চরাচরের কিছুই আর বাকি থাকে না।

তথাপি কাকার ঘাড় নড়ে।

নানারকমের খাবার দাবার—চপ কাটলেট, সন্দেশ, শন্‌পাপড়ি বিস্কুট চকোলেট, টফি লেবেনচুস্‌—মানে যতরকমের মুখচর আর মুখরোচক জিনিস হতে পারে তবু কাকাকে লালায়িত করা যায় না।

অবশেষে চটেমটে একজনের মুখ থেকে বেফাঁস বেরিয়ে যায় "তবে আর কি করবেন—শ্বেতহস্তীই সংগ্রহ করুন !"

কিন্তু পরিহাস বলে একে গ্রহণ করতে পারেন না কাকা। তিনি বারম্বার ঘাড় নাড়েন,—শ্বেতহস্তী ! সোনার পাথর বাটির মতো ও-কথাটাও আমার কানে এসেছে বটে। বর্মা মুলুকে না শ্যাম রাজ্যে কোথায় যেন পাওয়া যায়। তার পূজাও হয় বলে শুনেছি। হ্যাঁ, যদি সংগ্রহ করতে হয়ে তবে সেই জিনিস। বড় লোকের আস্তাবল দূরে থাক, বিলেতের চিড়িয়াখানাতেও এক আধটা আছে কিনা সন্দেহ। পঞ্চম জর্জও তাঁর য়্যাল্‌বামে রাখতে পারেননি ! হ্যাঁ, ওই ! ওই শ্বেতহস্তীই আমার চাই।

তক্ষুণি কাকার রোখ হয়, শ্বেতহস্তীই তাঁকে দিতে হবে এনে—শ্যামরাজ্য কি ব্রহ্মরাজ্য থেকে হোক, হাতীপোতা কি হস্তিনা থেকে হোক, জলপাইগুড়ি কি জব্বলপুর থেকে হোক, করাচী কি রাঁচী থেকে হোক, উনি সেসব জানেন না, কিন্তু শ্বেতহস্তী ওঁর চাই। চাইই, যেখান থেকে হোক যোগাড় করে দিতেই হবে, তা যত টাকা লাগে লাগুক। এক আধখানা হলে চলবে না, ডজনকে ডজন চাই, তা নইলে কলেক্‌সন আবার বলে কাকে !

এই বিবৃতি দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্টার ডাকিয়ে, আসন্ন শ্বেতহস্তীদের জন্যে বড়ো করে আস্তাবল বানাবার হুকুম ছান।

আশ্চর্য ! দু হপ্তার মধ্যে জনৈক শ্বেতহস্তীও এসে

হাজির। নব গ্রহেরই এক উপগ্রহ কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছে।

খাসা শ্বেতহস্তী! চমৎকার! দেখতে! সকলে আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকি।

কাকা তো উচ্ছুসিত হয়ে ওঠেন—"বটে বটে। এই সেই শ্বেত হস্তী? বাঃ! দিব্যি ফরসা রঙ তো। বাঃ বাঃ!"

অনেকক্ষণ তাঁর মুখ থেকে বাহবা ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না। হাতীটাও তার সাদা শুঁড় নেড়ে কাকার সমর্থন করে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "জানিস, বার্মায়,—না না, বার্মায় না, শ্যামরাজ্যে এরকম একটা হাতী পেলে রাজারা মাথায় করে লুফে নেয়। মন্দিরে নিয়ে গিয়ে রাখে। রাজার চেয়ে বেশী খাতির হাতির! পূজো হয় রীতিমতো—হুঁ হুঁ, শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে—রাজা নিজে পূজো করেন। রাজপূজো যাকে বলে! জানিস্?"

এমন সময় হাতীটা একটা ডাক ছাড়ে। যেন কাকার গবেষণায় সায় দিতে চায়—উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করে।

হাতীর ডাক যে কিরকম তা একমুখে বর্ণনা করা যায় না। সে-ডাক ঘোড়ার চিঁহিহি কি গোরুর হাম্বার মতো নয়, ঘোড়ার ডাকের বিশ ডবল, গোরুর অন্ততঃ পঞ্চাশগুণ একটা হাতীর আওয়াজ। বেড়ালের কি শেয়ালের ধ্বনি নয় যে সহজে এক মুখে ব্যক্ত করা যাবে।

হাতীর ডাক ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য নেই আমার।

ডাক শুনেই আমরা দু চার দশ হাত ছিট্‌কে পড়ি। কাকাও পাঁচ গজ পিছিয়ে আসেন।

"বাঃ বাঃ! যেন মেঘ ডাকল।" 'কাকা বলেন, "সিংহের ডাক কখনো শুনিনি, তবে বাঘ কোথায় লাগে! হ্যাঁ, এমন না হলে একখানা ডাক! এ না হলে হাতী? একি তোমার ডাকটিকিট?"

উপগ্রহটি, যিনি হাতীর সমভিব্যহারে এসেছিলেন, এতক্ষণে একটি কথা বলার সুযোগ পান্—"প্রায়ই ডাকবে এরকম। শুন্‌তে পাবেন হর্‌দম—যখন তখন।"

প্রায়ই ডাকবে? রাত্রেও? তাহলে তো ঘুমোনোর দফা রফা—কাকা যেন একটু ভাবনায় পড়েন।

"উঁহু, রাত্রে ডাকে না। হাতীও ঘুমোয় তো। রাত্রে কেবল ওদের শুঁড় ডাকে।"

"তা ডাকে ডাকুক। ডাকুক গে শুঁড়! আমাদেরও কি নাক ডাকে না? কিন্তু কিরকম রঙটা বল্‌তো!" "আবার আমার দিকে তাকান কাকা—"যেন ধব্ ধব্ করছে। আর সব হাতী এর কাছে দাঁড়াতেই পারে না, তারা হাতী নয় —যতো জানোয়ার। আহেল বিলাতী সাহেবের কাছে যেন সাঁওতাল। এই ফর্সা রঙটি এর বজায় রাখতে হলে সাবান্ মাখিয়ে একে চান্ করাতে হবে দুবেলা—ভালো বিলিতি সাবান, হুঁ হুঁ। পয়সার দিকে গ্রাহ্য করলে চল্‌বে না। আমার এমন সোনার হাতী কালো হয়ে যেতে কতক্ষণ?"

"না না, অমন কাজটিও করবেন না। উপগ্রহটি সবিনয়

প্রতিবাদ করে—"আজ্ঞে, ঐটিই বারণ। স্নানটান এর একেবারে বন্ধ। শ্বেতহস্তীর গায়ে জল ছোঁয়ানোই নিষেধ, তাহলেই গলগণ্ড হয়ে মারা যাবে।"

"য়্যাঁ, বলো কি?" কাকা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন,—"তাহলে, তাহলে?"

"ইতর হাতীর মতো নয়তো যে রাতদিন জলে পড়ে থাকবে। শ্যামরাজ্যে রীতিমতো মন্দিরে লোহার সিংহাসনের ওপরে বসানো থাকে, সেখানে হরদম্ ধূপধূনো পূজো আর আরতি চলে। কেবল চন্নামৃত তৈরীর সময়েই যা এক আধ ফোঁটা জল ওর পায়ে ছোঁয়ানো হয়। এখানে তো সেরকম হবে না।"

কাকা তার কথা শেষ করতে দ্যান না—"এখানে কি করে হবে? রাতারাতি মন্দিরই বা বানাচ্ছে কে, আর লোহার সিংহাসনই বা পাচ্ছ কোথায়? তবে পূজারী জোগাড় করা হয়তো কঠিন হবে না, পুরুৎ বামুনের তো আর অভাব নেই পাড়ায়, কিন্তু হাতী পূজোর মন্ত্র কি তারা জানে?"

কাকার প্রশ্নটা আমার প্রতিই হয়। আমি জবাব দিই—"হাতীর চন্নামৃত আমি কিন্তু খেতে পারবো না কাকা।"

গোড়াতেই প্রতিবাদ করে রাখা ভালো। কথায় বলে সেফ্‌টি ফার্স্ট্।

কথাটা কিন্তু সেফ্‌টি পিনের ন্যায় কাকার গায়ে লাগে—"পারবি না? কেন পারবি না? একি তোর গুজরাটি হাতী কালো আর ভূত? এ হোলো গিয়ে ঐরাবতের বংশধর, স্বর্গের

দেবতাদের সগোত্র। খেতেই হবে তোকে—তা না হলে পরীক্ষায় পাশ করতেই পারবিনে।"

পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে 'মেড-ইজির' কাজ করবে জেনে আমি একটু নরম হই। সন্ধির সূত্রপাত করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে উপগ্রহটিই বলে ছ্যায়—না না, পূজো করবার আবশ্যক নেই। হস্তী পূজোর ব্যবস্থা তো নেই এদেশে। নিত্য কর্মপদ্ধতিতে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। পূজো করার দরকার করে না, আস্তাবলে ওকে অম্‌নি বেঁধে রাখলেই হবে। গায়ে জলের ছোঁয়াচটিও না লাগে, সহিস্‌ কেবল এই দিকে কড়া নজর রাখে যেন।

"সহিস্‌? হাতীর আবার সহিস কি? মাহুতের কথা বল্‌ছ বোধহয়?" কাকা জিজ্ঞাসা করেন।

"সহিস, মানে যে ওর সেবা করবে, ওকে সইবে।" সহিস কাঁধে বসলেই মাহুত হয় কিনা। কিন্তু ওর কাঁধে বসা যাবে না তো। ভয়ানক অপরাধ তাতে।"—উপগ্রহটি ব্যাখ্যা করে ছ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতীর উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার করে কিংবা নিজের মাথাই চুলকায় কিনা কে জানে।

"ওর স্নানের ব্যবস্থা তো হোলো, আচ্ছা, এবার ওর আহারের ব্যবস্থাটা শুনি"—কাকা উদ্‌গ্রীব হন, "সাধারণ হাতী তো নয় যে সাধারণ খাবার খাবে"—তারপর কি যেন একটু ভাবেন—"খায় টায় তো, না তাও বন্ধ?"

তাঁর অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা সবাই অবাক হই। বলে ফেলি—

খাবেনা কি বলছেন ? অত বড়ো দেহ টিকবে কেন তাহলে ? কথায় বলে হাতীর খোরাক !

"আমি ভাবছিলাম, চানটানের পাট যখন নেই তখন খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গাম্ আছে কিনা কে জানে !" কাকা ব্যক্ত করেন : "তা কী খায় ও বলতো ।"

উপগ্রহটি বলে, সব কিছুই খায়—সে-বিষয়ে ওর রুচি খুব উদার। মানুষ পেলে মানুষ খাবে, মহাভারত পেলে মহাভারত। মানে, মানুষ আর মহাভারতের মাঝামাঝি যা কিছু আছে সবই খেতে পারে। যদি নাগালে পায়—মানে, ওর গালে পায় যদি।

আমি টিপ্পনি কাটি, তাহলে হজম শক্তি তো বেশ।

"ভালো, খুবই ভালো।" কাকা সন্তোষ প্রকাশ করেন, "যদি মানুষ পায়, কতগুলো খাবে ? অবশ্যি টাট্‌কা মানুষ ?"

যতগুলো ওর কাছাকাছি আসবে। টাট্‌কা বাসি নিয়ে বড়ো বিশেষ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। বলেছি তো ভারী উদার রুচি। সর্বজীবে সম দয়া।

তুই ওর কাছে যাস্‌নে যেন খবরদার।"—কাকা আমাকে সাবধান করেন, "তবে তোকে মানুষের মধ্যেই ধরবে কিনা কে জানে।"

হ্যাঁ, তা ধরবে কেন ? আমি মনে মনে রাগি, তা যদি ও না ধরতে পারে, তাহলে ওকেই বা কে মানুষের মধ্যে ধরতে যাচ্ছে ? ওর রুচি যেমনই হোক, ওর বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসা আমি তো করতে পারব না। একটা কাকার মধ্যেই গণ্য করব আজ থেকে।

তবু একেবারেই নিশ্চিন্ত হতে চান কাকা—"খাদ্য হিসেবে কি ধরণের মানুষের ওপর ওর বেশি ঝোঁক?"

একবার কটাক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে নেন, যেন আমার জন্যই যতো ওঁর ভাবনা।

"চেনা লোকেরই অধিক পক্ষপাতী, চেনাই পছন্দ করবে বেশি। তবে অচেনাদের ওপরেও আক্রোশ নেই তেমন তাদেরো ধরে খাবে।"

"ভালো ভালো। আর কতগুলো করে মহাভারত—প্রত্যেক ক্ষেপে?"

"ক্ষেপে? ক্ষেপে গেল কতো খাবে বলতে পারিনে—হয়তো পূরো একটা সংস্করণই সাবড়ে দিতে পারে।"

"বল্‌ছো কি? অষ্টাদশ পর্ব ইয়া ইয়া মোটা এক হাজার কপি—"

"অনায়াসে।" উপগ্রহটি জোরের সঙ্গে জানায়—"অবহেলায়।"

"—সচিত্র মহাভারত?" কাকা বাক্যটাকে শেষ করে আনেন।

"সচিত্র? ছবির দিকে ভ্রক্ষেপই করবে না।"

"হাতী বোঝে ছবির মর্ম?" আমি যোগ করি।

"না বুঝুক।" কাকা আমার প্রতি রোষকষায়িত হন—"সবাইকেই চিত্রকলার সমঝ্‌দার হতে হবে তার কি মানে আছে?"

উপগ্রহের প্রতি প্রশ্ন হয়,—"সেকথা যাক। মানুষ আর

মহাভারত ছাড়া আর কি কি খাবে ? খুঁটিনাটি সব জেনে রাখা ভালো।”

“ইঁট পাটকেল পেলে মহাভারত ছোঁবেও না, শালদোশালা পেলে ইঁট পাটকেলের দিকে ফিরেও তাকাবে না, আবার শালদোশালা ছেড়ে বেড়ালকেই বেশি পছন্দ করবে, কিন্তু রসগোল্লা যদি পায় বেড়ালকেও ছেড়ে দেবে। রসগোল্লা ফেলে কলাগাছ খেতে চাইবে, মানে, এক আলিগড়ের মাখন ছাড়া সব কিছুই খাবে। অক্লেশে।”

“কেন, মাখন নয় কেন ? মাখন তো সুখাদ্য।”

“মাখনকে ঠিক ধরতে পারবে না কিনা। শুঁড়েই লেগে লেপটে থাকবে, ওকে কায়দায় আনা কঠিন তো।”

ও !—কাকা বুঝতে পারেন এইবার।

“হ্যা, সেকথা ঠিক। মাখন বাগানো সহজ নয় বটে।” আমি বলি, “এক পাঁউরুটি ছাড়া আর কেউই বাগাতে পারে না।”

“যাক, খাদ্য তো হোলো, এখন পানীয় ?” কাকা জিজ্ঞাসু।

“তরল পদার্থ যা কিছু আছে। দুধ, জল, ঘোলের সরবৎ, ক্যাষ্টর অয়েল, মেথিলেটেড্ স্পিরিট—কত আর নাম করবো ? কার্বলিক য়্যাসিডেও কিছু হবে না ওর, তারও দু-দশ বোতল দু চুমুকে ফুঁকে দিতে পারে। কেবল শুধু চা খায় না।”

“ওটা গুড্ হ্যাবিট। ভালো ছেলের লক্ষণ।” কাকা ঈষৎ খুসী হন, “সিগারেট টানতেও শেখেনি নিশ্চয় ? সবই তো জানা হোলো, কিন্তু কী পরিমাণ খায় তা তো বললে না হে ?”

''যতো জুগিয়ে উঠতে পারবেন। এক আধ মণ, এক আধ নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবে।''

"তার আর কি হয়েছে ? কেবল এক মানুষটাই পেরে উঠবো না বাপু, ইংরেজ রাজত্ব কিনা! হাতীকে কিম্বা আমাকে—কাকে ধরে ফাঁসিতে লটকে ছ্যায় কে জানে! তবে আজই বাজারে যত মহাভারত আছে বইয়ের দোকানে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। ময়রাদের বলে দিচ্ছি রসগোল্লার ভিয়েন বসিয়ে দিতে। আমার কলাবাগানটাও ওরই নামে উইল করে দিলাম। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করুক। আর ইঁট পাটকেল ? ইঁটপাটকেলের অভাব কি ? আস্তাবল বানিয়ে যা বেঁচেছে ওর আস্তানার পাশেই স্তুপাকার হয়ে আছে। যতো খুসি খাক্ না। যা ওর পেটে ধরে—ইচ্ছেমত খাক, কোনো আপত্তি নেই আমার।"

অতঃপর মহা সমরোহে হাতীকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হোলো। আমরা সবাই শোভাযাত্রা করে পিছু পিছু গেলাম। শেকল দিয়ে ওর চার পা বেঁধে আটকানো হোলো শক্ত খুটির সঙ্গে। শুঁড়টাকেও বাঁধা হবে কি না আমি শুধাই। শুঁড় ছাড়া থাকবে জান্‌তে পারা গেল। শুঁড় দিয়েই ওরা খায় কি না, কেবল তরল ও স্থূল খাদ্যই নয়, হাওয়া খেতে হলেও শুঁড়ের দরকার।

হাতীর দাম শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম নয়। যে লোকটা বেচেছে সে থাকে দুশো ক্রোশ দূরে; তার এক আত্মীয় শ্যামরাজ্যের জঙ্গল-বিভাগেব

কর্মচারী—সে-ই সেখান থেকে ধরে ধরে চালান্ ছায়। উপগ্রহটি অনেক করে তাকে জপিয়ে, আরো কেনার
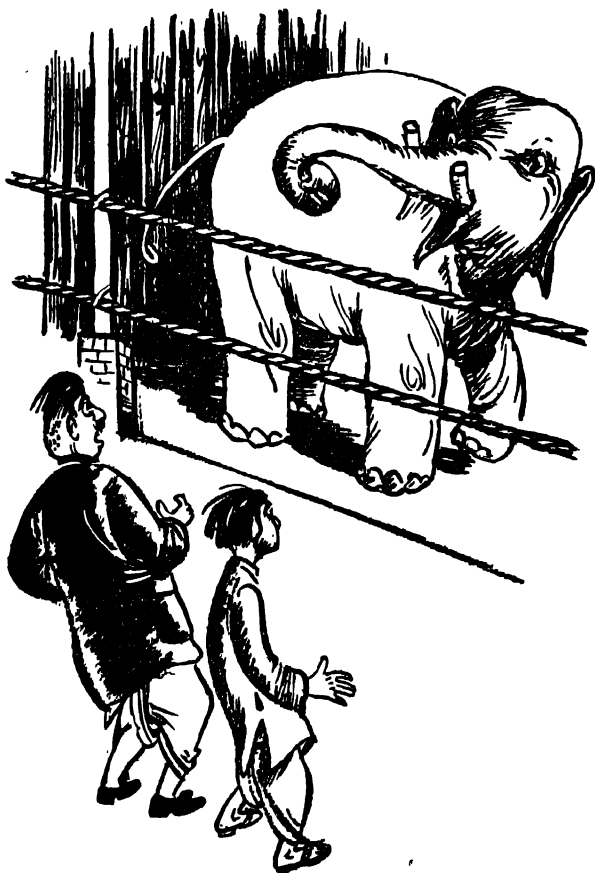
হাতীর শুঁড়-বাহার !

লোভ দেখিয়ে তবেই এটি তার কাছ থেকে এত কমে আদায় করতে পেরেছে। নইলে হয়তো লাখটাকাই এর দাম

লাগতো! আসলে এর দামই হয় না, অমূল্য পদার্থই বল্‌তে গেলে এই শ্বেতহস্তী।

হাতীকে এতদূর হাঁটিয়ে আনতে, আর তার সঙ্গে হেঁটে আসতে ভদ্রলোকের কি কম কষ্ট হয়েছে! কিন্তু কী করবেন, কাকার হুকুম। কেবল সেইজন্যেই—নইলে কে আর প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক শ্বেতহস্তীর সঙ্গে এতটা হেঁটে আসে!

তাত বটেই, তাত বটেই! কাকা অম্লানবদনে তখনি তাকে পঞ্চাশ হাজারের একখানা চেক কেটে ছান।

"আরো আছে এমন, আরো আনা যায়," উপগ্রহটি জনায়, "এরকম শ্বেতহস্তী যতো চান্, দশ বিশ পঞ্চাশ—ওই এক দর কিন্তু।"

"আরো আছে এমন?" কাকা এক মুহূর্ত একটু ভাবেন, "বেশ, তুমি আনাবার ব্যবস্থা করো। তাতে আর কি হয়েছে, পঁচিশ লাখ টাকার শ্বেতহস্তীই কিনবো না হয়। কী হয়েছে?"

"বড় মানুষের বড় খেয়াল!" সেই পুরাতন গ্রহটি এতক্ষণে বাঙনিস্পত্তি করে,—"তা নাহলে বড়লোক কিসের?"

সেই পুরাতন কথা—পুরাণ-কাহিনী!

তুদিন যায়, পাঁচদিন যায়। হাতীটাও বেশ আরামে আছে। আমরা তুবেলা দর্শন করি। কাকা আর আমি দেখি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে; কাকিমা ছাখেন ভক্তিভরে। কাকিমা অনেককিছু মানৎও করেছেন, হাতীর কাছে ঘটা করে পূজো

আর জোড়া বেড়াল দেবেন জানিয়েছেন। কাকিমার এখনো ছেলে-পুলে হয়নি কি না।

কলা গাছ খেতেই ওর বেশি যেন উৎসাহ। ইঁট পাটকেল পড়েই আছে, স্পর্শও করেনি। দু একটা বেড়ালও এদিক ওদিক দিয়ে গেছল, হাতীকে তারা ভালো করেই লক্ষ্য করেছে, ও কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। গাদা গাদা মহাভারত কোণে পুঁজি-করা—তার থেকে একখানা নিয়ে ওকে আমি দিতে গেছলাম একদিন। পাওয়া মাত্র উদরস্থ করবে এই আমি আশা করেছি কিন্তু মুখে দেয়া দূরে থাক, বইখানা শুঁড়তলগত না করেই এমন সজোরে আমার দিকে ছুঁড়েছিল যে আর একটু হলেই আমার মাথা উড়ে যেত।

কাকা বললেন, বুঝতে পারলিনে বোকা! তোকে পড়তে বলছে। ধর্মপুস্তক কিনা! মন দিয়ে পড়্। মুখ্যু হয়ে থাকলি, ধর্ম-শিক্ষা তো হোলো না তোর একটুও!

ধর্মশিক্ষা মাথায় থাক্। কাকার পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছি এই ঢের! না, এরপর থেকে এইসব ধর্মাত্মা হাতীর কাছ থেকে সাত হাত দূরে থাকতে হবে।

এইভাবে হপ্তাতিনেক কাটার পর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামলো। মুড়ি নিয়ে পাঁপরভাজা দিয়ে অকালবর্ষণটা আমরা উপভোগ করছি। এমন সময় মাহুৎ কিম্বা সেই সহিস এসে খবর দিল বাদ্‌লার সাথে সাথে হাতীটা ভয়ানক ছটফটানি সুরু করেছে। হাঁকডাক ছাড়ছে খুব। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলাম আমরাসবাই।

কী ব্যাপার? সত্যিই ভারি ছটফট করছে হাতীটা। মনে হয় যেন চার পা তুলে লাফাতে চাইছে।

কাকা মাথা ঘামান খানিকক্ষণ। তারপর বলেন—বুঝতে পারা গেছে। মেঘ ডাকছে কিনা। মেঘ ডাকলে ময়ূর নাচে। হাতীও নাচতে চাইবে তার আশ্চর্য কি! ময়ূর আর হাতী—আকারে প্রকারে এক না হলেও আসলে ওরা সগোত্র। ভেবে ছাখো, কার্তিক আর গণেশ ছুই মা দুর্গার ছেলে। কার্তিক ময়ূরকে বাহন করেছেন। আর গণেশ হাতীর মাথা বহন করেছেন।—যাই হোক, ওর তিন পায়ের শেকল খুলে দাও—কেবল এক পায়ের বাঁধন থাক। নাচুক একটু।

তিন পায়ের শেকল খুলতেই ও যা স্থরু করল, হাতীর ভাষায়, তাকে নাচই বলে থাকে বোধহয়। কিন্তু সেই নাচের উপক্রমেই, আরেক পায়ের শেকল ভাঙতে দেরি হয় না। মুক্তি পাবা মাত্র হাতীটা উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়ে, সহিস বাধা দেবার সাহস করার আগেই এক শুঁড়ের ঝাপটে ওকে শুইয়ে দিয়ে যায়।

তারপর করুণ আর্তনাদ করতে করতে মুক্তকচ্ছ হাতী শুঁড় তুলে ছুটতে থাকে সদর রাস্তা ধরে। আমরাও, দস্তুরমতো ব্যবধান রেখে, পেছনে পেছনে ছুটি। কিন্তু হাতীর সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারবো কেন? আমাদের মানুষদের মাত্র ছুটি করে পা আর হাতীর তুলনায় তাও সরুসরু। দেখতে না দেখতেই

হাতীকে আর দেখা যায় না, কেবল তার ডাক শোনা যায়। অতি সুদূর থেকে তার গর্জন ভেসে আসে।

তিনঘন্টা পরে খবর এলো, মাইল পাঁচেক দূরে, এক পুষ্করিণীতে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মহত্যা করবে নাকি? শ্বেতহস্তীর কাণ্ড, কিছুই বোঝা যায় না। কাকিমা কাঁদতে সুরু করে দ্যান্, হয়তো ঠিকমতো পূজো-আচ্ছা করা হয়নি, হস্তীদেব তাই রুষ্ট হয়েছেন। ক্ষেপে গিয়ে শাপ দিলে এখন কি সর্বনাশ হয় কে জানে! শেষে বংশলোপই হবে হয়তো!

বংশ বলতে তো সর্বসাকুল্যে আমি, যদিও পরস্মৈপদী। কাকিমার কান্নায় আমারই কান্না পায়।

কাকা এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ছোটেন শ্বেতহস্তীকে প্রসন্ন করতে। আমরাও সকলে চলি কাকার সঙ্গে। কিন্তু হাতীর যেরকম নাচ আমি দেখেছি তাতে সহজে ওকে হাতানো যাবে বলে আমার মনে হয় না।

পথের ধারে মাঝে মাঝে ভাঙা আটচালা নজরে পড়ে, সেগুলো বাদ্‌লার ঝাপটে না হাতীর দাপটে কিসে উড়েছে বোঝা যায় না ঠিক। আশে পাশে জনপ্রাণীও নেই যে জিজ্ঞেস করে জানবো। যতদূর সম্ভব হস্তীবরেরই কীর্তি! শ্বেতশুণ্ডের প্রাদুর্ভাব দেখেই বাসিন্দারা মুল্লুক ছেড়ে সটকেছে এই রকমই মালুম হয়।

কিছুদূর গিয়ে হস্তীলীলার আরো ইতিহাস জানা যায়। একদল গঙ্গাযাত্রী একটা আধমড়াকে গঙ্গায় নিয়ে যাচ্ছিল,

এমন সময়ে চতুস্পদ মহাপ্রভু এসে পড়েন। অমন ঘটা করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাস্তা জুড়ে যাওয়াটা ওঁর মনঃপূত হয় না, শুঁড় নেড়ে উনি ওদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। শোনা গেল এক একজনকে অনেক দূর অব্দি তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। কেবল বাদ দিয়েছেন, কেন জানা যায়নি, শুধু সেই-গঙ্গাযাত্রীকে। সে বেচারা অনেকক্ষণ একলা অবহেলায় পড়ে থেকে, কাউকে আসতে না দেখে অগত্যা উঠে বসে, দেহরক্ষা কাজটা এযাত্রা স্থগিত রেখে, কারো কাঁধ না পেয়ে নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরে গেছে—শেষমেষ।

অবশেষে সেই পুকুরের ধারে আমরা এসে পড়ি। কাকা আমার বহু সাধ্যসাধনা, বহুৎ স্তবস্তুতি করেন। হাতীটা শুঁড় তুলে শোনে, কিন্তু মোটেই নড়ে না। রসগোল্লার হাঁড়ি ওকে দেখানো হয়, ঘাড় কাৎ করে ছ্যাখে কিন্তু হাঁড়ির সঙ্গে মোলাকাৎ করার তার আগ্রহ দেখা যায় না।

পুকুরটা খুব বড় নয়, কাকা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ান, কাছাকাছি কথা কইলে যদি ফল হয়। কিছু ফল হয়, কেননা হাতীটা কাকা-বরাবার তার শুঁড় বাড়িয়ে ছ্যায়।

আমি বলি—পালিয়ে এসো কাকা। ধরে ফেলবে।

দূর্! আমি কি ভয় খাবার ছেলে? তোর মতন অত ভীতু নই আমি।—কাকার সাহস দেখা যায়,—কেন, ভয় কিসের? আমাকে কিচ্ছু বল্‌বে না। আমি ওর মনিব—মনিব—উঁহুহু—শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু—

বলতে গিয়ে কাকা জিভ কাটলেন, বোধহয় কাকিমাকে

স্মরণ করে।—উঁহু, মনিব কেন হব? অপরাধ নিয়োনা প্রভু শ্বেতহস্তী। আমি তোমার দাসানুদাস। আমি তোমার শ্রীচরণের—তোমার চারপায়ের গোলাম। কী বলতে চাও বলো, আমি কান বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার ভক্তকে তুমি কিছু বলবে না আমি জানি। হাতীর মতো কৃতজ্ঞ জীব দুনিয়ায় দুটি নেই, আর তুমি তো সামান্য হাতী নও, তুমি হচ্ছো হাতী সম্রাট।

কাকা কান বাড়িয়ে দ্যান, হাতী শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়—আমরা রুদ্ধশ্বাসে উভয়ের আলাপের অপেক্ষা করি।

কর্ণহস্তিসংবাদ দেখি উৎকর্ণ হয়ে।

হাতীটা কাকার সর্বাঙ্গে তার শুঁড় বুলায়, কিন্তু সত্যিই কিছু বলে না। কাকার সাহস বেড়ে যায় আরো, কাকা আরও এগিয়ে যান। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন,—দেখছিস্ কেমন আদর করছে আমায়?

কিন্তু হাতীটা অকস্মাৎ শুঁড় দিয়ে কাকার কান পাক্ড়ে ধরে। কানে হস্তক্ষেপ করায় কাকা বিচলিত হন—কেন বাবা হাতী? কী অপরাধ করেছি বাবা তোমার শ্রীচরণে যে এমন করে তুমি আমার কান মল্ছো?

কিন্তু হস্তীরাজ কর্ণপাত করেন না। হস্তিনাপুর আর কর্ণাট্, ভূগোলে পাশাপাশি না হলেও, এখানে জমাট হয়ে থাকে। কাকার অবস্থা ক্রমেই করুণ হয়ে আসে, তিনি আমার উদ্দেশে—চেষ্টা করেও আমার দিকে তাকাতে তিনি পারেন না—বলেন—বাবা মন্টু, কান গেল, বোধহয় প্রাণও গেল। তোর কাকিমাকে বলিস।

আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি ; কাকাকে ধরি গিয়ে। জলের মধ্যে একা হাতী, স্থলের ওপর আমরা সবাই। হাতীর চেষ্টা থাকে কাকার কান পাকড়ে জলে নামাতে, আর হাতীর চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় সেই দিকেই আমাদের চেষ্টা। মিলনান্ত কানাকানি শেষে বিয়োগান্ত টানাটানিতে পরিণত হয়। কান নিয়ে এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানিতে।

খানিকক্ষণ এই টাগ-অফ-ওয়ার চলে। শেষটায় হাতী পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু কাকার কান শিকার করে তারপরে। হাতীর হাতে কান সমর্পণ করে কাকা এযাত্রা প্রাণরক্ষা করেন।

কাকার কানটা হাতী মুখের মধ্যে পুরে ছায়, কিন্তু খেতে বোধ হয় ওর ভালো লাগে না। সেইজন্যই সে কান ফেলে এবার রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে তার শুঁড় বাড়ায়।

যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে কাকা বকেন—দিস্‌নে, খবরদার, দিস্‌নে ওকে রসগোল্লা! হাতী না আমার চৌদ্দ পুরুষ! পাজী ড্যাম্ শুয়ার রাস্কেল গাধা ইষ্টুপিট! উঃ, কিচ্ছু রাখেনি কানটার গো, সমস্তটাই উপড়ে নিয়েছে! উল্লুক বেয়াদব আহাম্মোক!

কাকার কথা হাতীটা যেন বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে আসে। ও হরি! একি দৃশ্য! গলার নীচে থেকে যে পর্যন্ত জলে ডুবে ছিল হাতীর কলেবর একেবারে কুচকুচে কালো, যেমন হাতীদের হয়ে থাকে, কেবল গলার উপর থেকে সাদা। অ্যাঁ, এ আবার কী?

তাকিয়ে দেখি পুকুরের কালো জল হাতীর রঙে সাদা হয়ে উঠেচে! শ্বেতহস্তীর এ আবার কোন্ লীলা?

কর্ণহারা হয়ে সে শোকও কাকা কোনোমতে এ পর্যন্ত সাম্‌লে ছিলেন, কিন্তু হাতীর এই চেহারা তাঁর অসহ্য হয়। তাঁর অত সাধের সাদা হাতী!

মূর্চ্ছিত কাকাকে ধরাধরি করে আমরা বাড়ী নিয়ে যাই। হাতীর দিকে আর ফিরেও তাকাই না আমরা। একটা বিশ্রী, বদ্, কালো ভুতের মত চেহারা, কদাকার কুৎসিৎ বুড়ো হাতী! উনি যে কোনো জন্মে লোহার সিংহাসনে বসে রাজপূজা লাভ করেছেন একথা কখনো ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করা কঠিন!

পরদিন একটা লোক এক জরুরি খবর নিয়ে আসে—সেই অনুসন্ধানী উপগ্রহের প্রেরিত অগ্রদূত। উপগ্রহটি আরো পঞ্চাশটা শ্বেতহস্তী সংগ্রহ করে কাল সকালেই এসে পৌঁছচ্ছেন সেই খবর। কাকার আদেশে প্রাণ তুচ্ছ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে দুশো ক্রোশ দূর থেকে চারপেয়ে হাতীদের সঙ্গে দু পায়ে পাল্লা দিয়ে সমানে হেঁটে তিনি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কে তুল্‌বে এই খবর কাকার কানে? মানে, কাকার অপর কানে?

গাড়ী ধরার ভারী তাড়া

সেবার প্লেগের ভয়ে শহর ছাড়তে হোলো। বিনির জন্যেই বেশি করে আরো। ইঁদুরে তার ভারী ভয়। আনাচে-কানাচে কোথাও কোনো নেংটির ল্যাজটুকু দেখলেও সে ডরিয়ে ওঠে। এম্নিতেই যা ভয়াবহ, স্বভাবতই, প্লেগাবহ হয়ে আরে তা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ালো। ইঁদুরকে দূর থেকে নমস্কার করে আমরা বিদূরিত হলাম।

ইঁদুরকে আমি ভয় খাইনে। আদৌ না। কেন খাবো? দেখেছি, ইঁদুররা আমাকে দেখলেই দৌড় মারে—এক দণ্ডও দাঁড়ায় না। ভালো করে যে দেখব সে ফুরসৎটুকুও দেয় না। আর, যে আমার ভয়েই পালায় তাকে আবার আমি ভয় করি? আর, যদি সে কাছে আসে—এসে গায়ে পড়ে—তবেই না প্লেগ?

শ্রীরামপুরে ডেরা নিলাম। কিন্তু নিলেই বা কি, আমার মত কলকাতাসক্ত লোকের পক্ষে কলকাতার মায়া কাটানো শক্ত ব্যাপার। রোজই আমায় কলকাতায় আসতে হয়—বেড়াতে, আড্ডা দিতে, কফি খেতে। (খাদ্য-কফি যা তরকারিতে খাই তা নয়, অ-খাদ্য কাফি—যা পান করতে হয়!) তাছাড়া আরো কতো আজে-বাজে ব্যাপারে—যার ঠিক ঠিকানা নেই।

সকালের ট্রেনে আসি, ফিরি সন্ধ্যেয় কিম্বা রাত্তিরে। গাড়ির যাতায়াতের সঙ্গে আমার গতিবিধি বাঁধা। আমার গাড়ির গতিবিধিও, বলতে কি!

তাই সেদিন সকালের চায়ের টেবিলে রেলোয়ের নতুন

টাইমটেবিলে ট্রেনের চালচলনের রদবদল দেখে চমকে গেলাম। নাড়ির গতি দ্রুততর হোলো আমার। দেখলাম, রেল-কর্তৃপক্ষ সকাল আটটা চোদ্দর গাড়িটিকে খারিজ করেছেন। আমাকে বিল্‌কুল্‌ না জানিয়েই টেবিলের পাতটা ছিঁড়ে বিনির হাতে দিলাম—“দেখছিস, কী সর্বনাশ করেছে আমার?”

স্বভাবতই, চটে গেলাম ভয়ানক। রেলগাড়ির সময়নিষ্ঠায় কোনোদিনই আমার আস্থা ছিল না। কিন্তু দেরি করে আসা, তাও বরং সওয়া যায়, কিন্তু এ যে একেবারেই না আসা! চিরদিনের মতই গা-ঢাকা দেওয়া। না, কারো এরকম বেচাল এমন কি রেলগাড়ি হলেও, কখনই মার্জনা করা যায় না।

“তা, তোমার এতে, রাগ কেন দাদা?” অবাক্‌ হয় বিনি।—“এতে তোমার কী এল গেল আমি তো বুঝিনে।”

মেয়েদের বুদ্ধি-বিবেচনা যে লোকে কম বলে তা এই জন্যেই। বোঝা যায় এতেই। বিনির বাক্যবিন্যাসেই মালুম হয়।

“আমার ভীষণ যায় আসে।” আমি বাৎলাই: “আমার জীবনধারাই বদলে যাবে এর জন্যে। মানে, বদলাতে হবে আমায়—বাধ্য হয়ে। আর, জীবনধারা বদলে যাওয়া কী—চট করে তা পাল্‌টে ফেলা যে কত কষ্টের—তার তুই কী বুঝবি? যার জীবন সেই বোঝে!” আমি দীর্ঘনিশ্বাস পাড়ি।

“শুনি তোমার জীবনচরিত। বুঝিয়ে বলো তো।” ও বলে।

“শুন্‌বি? শোন্‌ তাহলে।” নিজের বোঝা নামাই তখন:

"কলকেতায় যাবার তিনটে মোটে গাড়ি ছিল, জানিস্ তো ? মানে, আমি সকালের লোকালের কথাই বলছি। সাতটা

বিনির সহিত বাক্যবিনিময়

পঞ্চান্নর গাড়ি, তারপরে আটটা চোদ্দর, তারপরে সেই আটটা তেইশে। শ্রীরামপুর এসেই আমি স্থির করলাম যে সকালের

সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িই আমায় ধরতে হবে। কলকেতায় যেতে হলে ঐ গাড়িটেই সবার সেরা। স্থানীয় লোকের মুখেও ওর উচ্চপ্রশংসা শুনেছিলাম। পরের দুটোর মতন তত ভিড় থাকে না ওতে। বেশ হাত পা খেলিয়ে যাওয়া যায়। এমনকি, এক এক দিন নাকি এতই ফাঁকা থাকে যে গাড়ির মধ্যে পায়চারি করাও চলে—বাধা দেবার থাকে না কেউ কামরায়।...”

আমার ভ্রমণ কাহিনীর মাঝখানে বিনি বাধা ছায়—“বুঝলাম বুঝলাম। দিব্যি পায়চারি করতে করতে কলকাতা যাওয়া যায়।”

“কথার মাঝখানে কথা পাড়িস্‌এই তোর ভারী দোষ। বড্‌ডো বিচ্ছিরি। একটুও তোর আত্মসংযম নেই। তোর জন্যে কথার খেই হারিয়ে যায় আমার।...কী বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর ভিড় থাকে আটটা তেইশের গাড়িটায়। যতো আফিসের বাবুরা যায় কিনা সেইটেয়? সেই গভীরতার ভেতর এই বপু নিয়ে যদি বাপু আবার আমি সেঁধুই—ভিড়ি গিয়ে সেই ভিড়ে—এই অধমের দ্বারা উক্ত লোকালের লোকসংখ্যা আর একগুণ বাড়াই—না, সেরূপ বিপুল বাসনা কোনোদিনই আমার ছিল না।”...

“একগুণ? না, পয়েণ্ট জিরো জিরো জিরো এক গুণ?” বিনি ধাক্কা মারে আবার। একেবারে শূন্যপুরাণ এনে ফ্যালে।—“বাদুড়ঝোলা একটা ট্রেনে মোট কতো লোক থাক তোমার আন্দাজ?” শুধোয় আমাকে।

“০০০১ গুণ? তা, তুই বলতে পারিস। অঙ্কে তোর

মাথা বেশি।" ওর গুণফল আমি মেনে নিই—মাথা পেতেই। নিজের গুনপণার ওপর তেমন বিশ্বাস নেই আমার।

"তা সে যাই হোক্, আমার বক্তব্য হচ্ছে আটটা তেইশের গাড়িতে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাওয়ার চেয়ে সকালের সাতটা পঞ্চান্নয় যাওয়া ঢের শ্রেয়ঃ। ঢের আরামের। তাই এখানে এসেই আমি স্থির করলাম যে কলকেতায় যেতে হলে—আর, যেতেই তো হবে রোজ—যতো কাজে আর অকাজে—তাহলে—সকালের ঐ সাতটা পঞ্চান্নকেই পাক্‌ড়াতে হবে আমায়।"

"তুমি বল্‌ছো কী বলতো ? মাথায় ঢুকছে না মোটেই।" বিনি মাথা নাড়েঃ "তুমি বল্‌লে যে আটটা চোদ্দর গাড়িটা বাতিল হয়েছে ? সাতটা পঞ্চান্ন তো হয়নি ? সে তো তেমনি আছে—ছিল যেমন। যাচ্ছে-আসছে আগের মতই ? তবে ? তাহলে তোমার অসুবিধাটা হোলো কোন্‌খানে ?"

"কোন্‌খানে! টের পাচ্ছিস না তুই ?"

"একদম্ না। আর তাছাড়া বাপু, সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িতে তো তুমি যাও না কক্ষনো। একদিনও যেতে দেখিনি তোমায়—।"

"গেছি কি যাইনি সেকথা তো উঠছে না এখানে। আসল কথা, ঐ গাড়িতেই যাবার বাসনা আমার বরাবর। সর্বদা ঐ ট্রেনটাই আমি ধরতে চেয়েছি। সাতটা পঞ্চান্নরটা বাতিল হলে তো আমাকে আরো কাহিল করতো। দুঃখের আমার থই থাকতো না। কেননা তখন আমাকে ধরবার জন্যে

আরেকটা গাড়ি ঠিক করতে হোতো বাধ্য হয়ে। কিন্তু তুই দেখতেই পাচ্ছিস, সাতটা পঞ্চান্নকে না করে ওরা বর্‌বাদ করেছে আটটা চোদ্দকে এবং এটা আমার ধারণায় আরো বেশি গুরুতর ব্যাপার। আমার জীবনযাত্রার ওলোটপালোট হচ্ছে এর জন্যেই। মানে, এর ফলে, আমার সকাল বেলার সব প্রোগ্রাম্‌ উনিশ মিনিট করে এগিয়ে দিতে হচ্ছে। আর, উনিশ মিনিট কিছু চাট্টিখানি না। খুব কম সময় নয়! একটা জীবনে রোজ রোজ এই উনিশ মিনিট—যদি আমাদের এই নশ্বর জীবনের কথা ভালো করে একবার বিবেচনা করা যায়।"

"উনিশ মিনিট এগিয়ে দিতে হচ্ছে কেন শুনি?" তথাপি সে বুঝতে পারে না।—"আর, এগুচ্ছোই বা তুমি কি করে শুনি?"

"কি করে? যারপরনাই কষ্ট করে। তার—তুই কী বুঝবি? হতভাগা রেলওয়ালাদের বদখেয়ালে এখন থেকে আমাকে আরো উনিশ মিনিট আগে বিছানা ছাড়তে হবে! আর, সকাল বেলায় বিছানা ছাড়া—সে যে কী দুঃসহ! ঘুম জিনিষটা কখনোই ফ্যাল্‌না না—সকাল বেলার তো নয়ই! সেই ঘুম ফেলে ওঠা যে কী কষ্টের সে খালি আমিই জানি। সেটা আমাকে এখন থেকে আরো উনিশ মিনিট আগে জানতে হবে। ঘড়িটাকে অ্যালার্মিং করতে হবে সেইমতন। তারপরে আবার দাড়ি কামানো—আরেক ঝঞ্ঝাট। তাও সারতে হবে উনিশ মিনিট আগে। তারপর প্রাতরাশ। তোর বানানো ডিমসেদ্ধ, টোস্‌ট, পোচ্‌, চা ইত্যাদির শ্রাদ্ধ করতে হবে উনিশ

মিনিট আগেই। এই সব প্রাতঃকৃত্য সেরে সুরে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুতে হবে ট্রেন ধরতে। পড়ি কি মরি করে ছুটতে হবে আমায়—"

"উনিশ মিনিট আগে।" ও-ই সম্পূর্ণ করে।—"কিন্তু কেন, তা আমায় বলো দেখি।"

"কেন?" আমি ওর দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি খানিক।

আমার মনে হয়, যতটা নয়, তারও বেশি বোকা বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে সে এক এক সময়। তার বোকামির বহর দেখিয়ে আমাকে তাক্ লাগাতে চায় কিনা ওই জানে!

"কেন? কেন এই উনিশ মিনিট? এই তোর—এত অঙ্কের মাথা?" না বলে আমি পারিনেঃ "আটটা চোদ্দর থেকে সাতটা পঞ্চান্ন বিয়োগ কর্, তাহলেই তুই টের পাবি। দেখতে পাবি যে ঠিক উনিশ মিনিটের ফারাক্।"

"কিন্তু বাপু তুমি তো সাত জন্মেও আটটা চোদ্দয় যাও না। তুমি যাও আটটা তেইশে। গাড়িটা ষ্টেশনের বাঁক ঘুরে এদিক দিয়েই যায় তো—আর, যাবার সময়ে আমি তো এই জানালাতেই দাঁড়িয়ে থাকি। দেখতে পাই যে তুমি দরজার হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলেছো। আমার এমন ভয় করে বাপু—" বল্‌তে গিয়ে সে শিউরে ওঠে।

"করবেই তো! আমারই কি করে না? কিন্তু করলে আর কী করছি! আটটা তেইশের গাড়িতে যা বেধড়ক্

ভিড়! ভেতরে পা বাড়াবো তার যো কি! দরজার মুখের লোকেদের ঠেলে ঢ‌ুকতে পারলে তো?"

"তবে? তোমার গাড়ি যখন সেই আটটা তেইশেই, তখন কেন যে তোমাকে উনিশ মিনিট আগে তৈরি হতে হবে তার তো কোনো মানে পাইনে। হোলোই বা বাতিল আটটা চোদ্দ,—বয়েই গেল! তাতে তোমার কী যায় আসে?"

অতি কষ্টে আমি নিজেকে দমন করি—যদিও আমি দেখেছি নিজেকে দমন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। আলুর দমের মতই সোজা। তাহলেও, চেষ্টা করেই নিজেকে দমাই। দমিয়ে—মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে—সহজবোধ্য ভাষায়—যেমন করে দুগ্ধ-পোষ্যদের বোঝায়—সেইভাবে ওকে সম্‌ঝাতে লাগি ঃ

"সবাই জানে সকলের জন্যেই তিনটে করে সকালের ট্রেন, দুনিয়ার সব জায়গাতেই। একটা সে ধরতে চায় (আমার ক্ষেত্রে এখানে যেটা সাতটা পঞ্চান্ন), একটা সে ধরতে গিয়ে একটুর জন্যে ফেল্ করে (আমার বেলা যেটা আটটা চোদ্দর), আর একটায সে শেষপর্যন্ত যায় (আমার সম্পর্কে যেটা আটটা তেইশ)। অতএব, শ্রীমতী বিনি, তোমাকে আমার করযোড়ে মিনতি,—মিনতি এবং বিনতি,—দয়া করে আমার সকালের খাবারটা এবার থেকে আরো উনিশ মিনিট আগে বানাবে? কাল থেকে—মানে, কাল সকাল থেকেই—আমার জীবনের গতি উনিশ মিনিট এগিয়ে গেল, সর্বদা মনে রেখো একথা। কাল থেকে আমায় সাতটা ছত্রিশের গাড়ি ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে হবে—"

"কিন্তু সাতটা ছত্রিশে তো কোনো গাড়ি নেই দাদা।" সে জানায়।

"নেই আমি জানি। কিন্তু তোর মতন মুষ্টিমেয় বুদ্ধি নিয়ে চলতে হলে কলকাতা আমার পক্ষে গয়া। চিরদিনের মতই সুদূরপরাহত। কোনো জন্মে সেখানে আর আমার পৌঁছুতে হবে না। সাতটা ছত্রিশে যে কোনো গাড়ি নেই সেকথা আমার বেশ জানা আছে। কিন্তু তাহলেও অতি আধুনিক কবির মতন, এই গাড়িটা আমাকে কষ্টকল্পনা করতে হবে। কেননা, সাতটা ছত্রিশের গাড়ি ধরার চেষ্টায় গেলেই তবেই আমি সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িটা ফেল্ করতে পারবো। যাবো আমি সেই আটটা তেইশে—বাদুড়ের মতন ঝুলে—রোজ যেমন যাই।"